ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ২০০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা, ৩ বছরের জন্য - ৫৭০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিস্ট্রি পোস্ট)** ১ বছরের জন্য - ৪৩০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৩৮০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৬০০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪২ বর্ষ ▪ ১২শ সংখ্যা ▪ গোবিন্দ ৫৩২ ▪ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

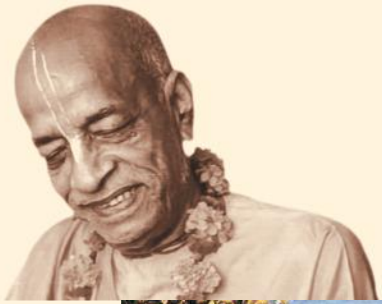

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা কেউ জানে না

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভগবানকে সন্তুষ্ট করা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করা। একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তত্ত্বাবধান করুক যাতে শ্রমিকেরা বুদ্ধিদীপ্তভাবে কাজ করে এবং ভগবানকে উপলব্ধি করে।

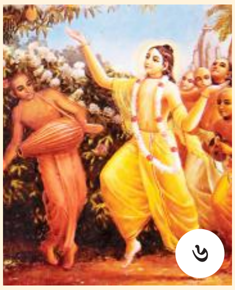
৬

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

ভগবানের লোভ

পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে অভিলাষের বীজ উৎপন্ন হলো এবং তার ফল হলো গৌরাঙ্গ স্বরূপ, গৌরাঙ্গ রূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য। আমি এখন আপনাদের কাছে এর ব্যাখ্যা করছি।

৮

প্রবন্ধ

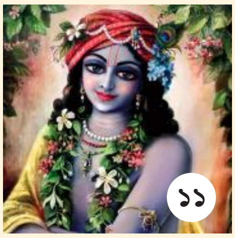
১১

১১ আদর্শ জীবন

প্রেমপূর্ণ শরণাগতি

শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমাদের জীবনে সাফল্য আসবেই, দুঃখ এবং উদ্বেগের কোন চিহ্নই সেখানে থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণে এক আনন্দময় নিত্য জীবনের জন্য দ্বার খুলে যায়।

১৭ দৈনন্দিন তিথিপত্র

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

৫৩৩ গৌরাব্দ, ২০১৯-২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ১৪২৫-১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৪ জুলাই ১৯ আষাঢ় ১৭ বামন বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। ২৪ আগস্ট ৭ ভাদ্র ৯ হৃষীকেশ শনিবার অষ্টমী ঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব। ৯ মার্চ ২৫ ফাল্গুন ২৯ গোবিন্দ সোমবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব।

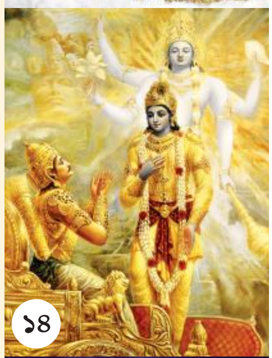
১৪

২৫ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন

নন্দবাবা, যশোদা মা, সখা-সখীদের ছেড়ে কৃষ্ণ অক্রূরের রথে করে চলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ঘটনাক্রমে বহু গোপিকা এখানে ব্যথিত বিরহ বিধুর চিত্তে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। অস্ফুটবাক্যে হা হুতাশ করছিল। তাদেরকে শান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি এখন মথুরা যাচ্ছি। ফিরে আসবো শীঘ্রই।

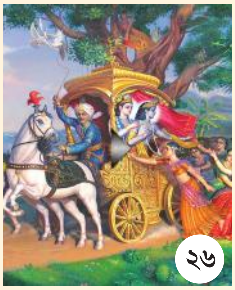
২৬

২৮ আচার্য বাণী

মহাজন কথা (শুকদেব গোস্বামী)

শুকদেব গোস্বামীর শ্যামবর্ণ ও নবযৌবন সমন্বিত অত্যন্ত সুন্দর দেহের লক্ষণ সমূহ বিচার করে, মহর্ষিরা তাঁকে এক মহাপুরুষ বলে চিনতে পেরে, তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

২৯

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

আমরা অনুশীলনের মধ্যে আছি। কিন্তু আমাদের তো কৃষ্ণপ্রেম জন্মাচ্ছে না। কেন?

১৫ ইসকন সমাচার

ইসকন নেতৃবৃন্দ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন

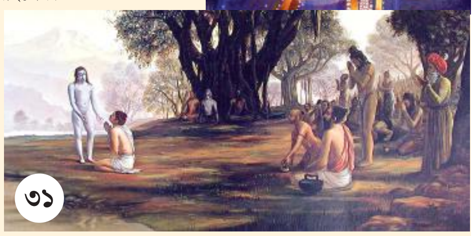
৩১

২১ ছোটদের আসর

চোখ বাঁধা মানুষ

২৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

ভেজ রোল

২৪ ভক্তি কবিতা

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

জড়সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়

আমরা সবাই অন্তরে শান্তি চাই, সন্তোষ অনুভব করতে এবং সুখী হতে চাই। আমরা ভাবি আমাদের জাগতিক অভিলাষ পূর্ণ করলেই আমরা এগুলি অর্জন করব। আমরা নিজেদের বলি, 'একবার আমি আমার লক্ষ্য বা লক্ষ্যগুলিতে পৌছাই তখন আমি সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হব।'

সমস্যা হলো যে, আমাদের জাগতিক অভিলাষগুলি পূর্ণ হলেও আমরা দেখি যে, আমরা আশানুরূপ আনন্দ পাই না। শীঘ্রই হৃদয়ে অন্য অভিলাষের উদয় হয় এবং সেগুলি পূরণ করতে আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করি এই আশায় যে, এগুলি পূর্ণ হলেই আমরা অসীম সুখ ও সন্তোষ অনুভব করব। কিন্তু এগুলি পূর্ণ হলেও সুখ ও শান্তি আমাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। আবার নতুন জাগতিক অভিলাষ পূর্তির জন্য আমরা কাজ শুরু করি। এই চক্র চলতেই থাকে। বস্তুত জাগতিক লাভের অভিলাষ পরিশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অপর মোকাবিলাটি হলো এই যে, এই পৃথিবীতে আমরা যা চাই সর্বদা তা পাওয়া সম্ভব নয়। অপূর্ণ অভিলাষগুলি ক্রোধের জন্ম দেয় এবং আমাদের মন বিক্ষিপ্ত থাকে। আমরা সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত বোধ করি।

ভগবদ্গীতার ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জাগতিক অভিলাষ চরিতার্থ করায় আনন্দ নেই, আনন্দ আছে ধৈর্য এবং বুদ্ধি সহযোগে তা নিয়ন্ত্রণ করায়। ভগবদ্গীতা (৫।২৩) আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বাচো বেগ, উদর বেগ ও উপস্থ বেগকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে সকল অভিলাষ আমাদের উত্তেজিত করতে সক্ষম সেগুলিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত।

যেমন একটি মাছকে জল থেকে তুলে সোনার পাত্রে রাখলে অসহনীয় যন্ত্রণা পেয়ে অবশেষে সেটি মারা যায়। অনুরূপভাবে আমাদের আত্মাকে আমরা জাগতিক সুখভোগ করিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইলেও তা যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে। জাগতিক ঐশ্বর্য সুখী হৃদয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় না। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছিল। হিরণ্যকশিপুর সকল বিলাস সামগ্রী ছিল কিন্তু তাদের হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ ছিল না। যদি আমরা পেট্রোল ঢেলে আগুন নেভাতে যাই তাতে আগুন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। অনুরূপভাবে যত বেশী করে আমরা জড়সুখের আকাঙ্ক্ষা করবো ততই আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হবে।

আমরা কৃষ্ণের অণু অংশ তাই আমরা তখনই সুখী এবং সন্তুষ্ট হতে পারি যদি আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণসেবার অভিমুখী করি। ঠিক যেমন আমরা বর্তমানে কৃষ্ণের সঙ্গে জ্ঞানত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি তাই এই জড় জগত আমাদেরকে জড় ভোগের তরঙ্গে ব্যাকুল করে রেখেছে।

কিন্তু আমরা যদি জড় ইন্দ্রিয় ভোগের লিপ্সা সমূহকে প্রতিহত করতে শুরু করি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের নির্দেশিত পথে আধ্যাত্মিক লিপ্সাকে বর্ধিত করি তাহলে মন শান্ত হবে, হৃদয় সন্তুষ্ট হবে এবং আমরা শুদ্ধতা লাভ করতে পারব।

'যারা কাম ক্রোধ শূন্য, সংযত চিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সেই সমস্ত সন্ন্যাসীরা সর্বতোভাবে অচিরেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।' (গীতা ৫।২৬)। পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা এই জগতে আমাদের পরম সুখে রাখবে এবং পরবর্তী জীবনে আমাদের অবশ্যই বৈকুণ্ঠ লোকে প্রেরণ করবে।

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা কেউ জানে না

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

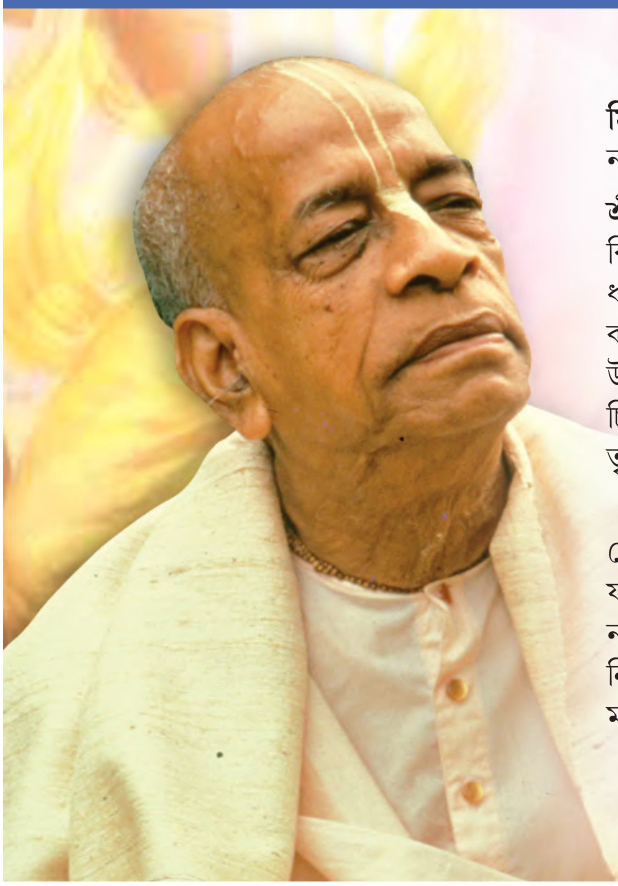

কথোপকথন ১৯৭৪, রাষ্ট্র সংঘের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সি. সি. হেনিস -এর সাথে তাশেম, জেনিভার, সুইৎজারল্যান্ড

মি. হেনিস — আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় এর বিকাশের প্রতি উৎসাহিত।

শ্রীল প্রভুপাদ — প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনাতে সামাজিক দেহ চারটি ভাগে বিভক্ত ঃ নির্দেশনার জন্য মস্তিষ্ক বিভাগ, সুরক্ষার জন্য হস্ত বিভাগ, জীবন ধারণের জন্য উদর বিভাগ এবং সহায়তার জন্য পদ বিভাগ। এদের প্রত্যেকের কর্ম হচ্ছে সামাজিক দেহকে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সমস্ত দেহের কর্ম হচ্ছে উপরোক্ত চারটি বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কিন্তু আপনি যদি বস্তুতভাবে চিন্তা করেন তাহলে মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রথম বিভাগ, বাহু হচ্ছে দ্বিতীয়, উদর হচ্ছে তৃতীয় এবং পদ হচ্ছে চতুর্থ।

আপনার দেহকে সুস্থ রাখার জন্য আপনি এই সকল বিভাগেরই যত্ন নেন। কিন্তু যদি আপনি সাধারণভাবে পায়ের যত্ন নেন এবং মস্তিস্কের জন্য যত্ন না নেন তাহলে আপনি কখনোই ভালো এবং সুস্থ দেহ পেতে পারবেন না। রাষ্ট্রসংঘ চতুর্থ বিভাগের যত্ন নিচ্ছে। প্রথম বিভাগটির জন্য তারা কি যত্ন নিচ্ছে? এটিই আমার প্রশ্ন। সমাজে বর্তমান সময়ে প্রথম শ্রেণী এবং চিন্তাশীল মানুষের প্রতি যত্ন খুবই নগণ্য।

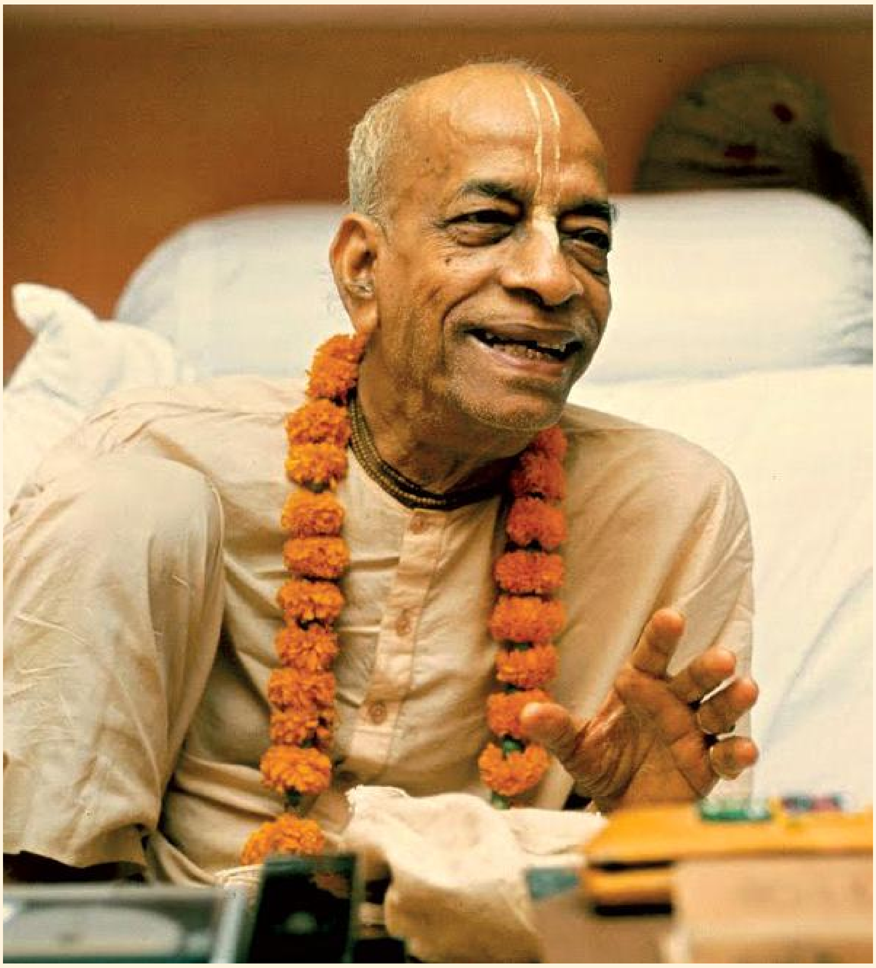

মি. হেনিস — আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম মূল এবং মুখ্য লক্ষ্য হলো সামাজিক ন্যায়ের বিকাশ করা এবং এর অর্থ এই যে, সমাজের প্রত্যেকটি শ্রমিকের জন্য সমাজে যথার্থ স্থান, মানুষের পূর্ণ মর্যাদা, শ্রমলাভের যথার্থ লভ্যাংশ ... আমরা এমন একটি মান নিশ্চয় করতে চেষ্টা করছি যাতে শ্রমিক সুরক্ষাতে সামাজিক ন্যায়ে সাম্যতা থাকে, পেশাগত সুরক্ষা থাকে, স্বাস্থ্যে সুরক্ষা থাকে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সমুহ প্রাধান্য পায়। তাছাড়াও পেশাদারী শ্রমিক যথা আর্কিটেক্ট, নার্স, ডাক্তার, পশুচিকিৎসাবিদ ইত্যাদি ন্যায় প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ — বৈদিক সূত্র অনুযায়ী সমাজে তিনটি উচ্চশ্রেণী যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এরা কখনোই কোন মালিকের দ্বারা আবদ্ধ হবে না। এরা সর্বদাই স্বাধীন থাকবে। শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী (শূদ্র) তারা অধীন থাকবে। আমার বক্তব্য সেটিই যে, রাষ্ট্রসংঘের এখন ভাবা উচিত যে, সমগ্র মানবসমাজ কিভাবে খেয়ালখুশি মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবনযাপন না করে পূর্ণ শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবে। আমি যেখানেই যাই এবং যখন কোন ভদ্রলোককে প্রশ্ন করি, 'জীবনের উদ্দেশ্য কি?' তিনি উত্তর দিতে পারেন না, তার অর্থ এই যে, সেখানে কোন প্রকৃত মেধাবী শ্রেণী নেই। কেউই জীবনের প্রকৃত, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, আত্মজ্ঞান উপলব্ধি এবং ভগবৎ উপলব্ধি সম্বন্ধে জানে না।

মি. হেনিস — আচ্ছা, আমি মনে করি যে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অসাম্য হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর যাতে তারা সকলেই জীবনের ভালো দিকগুলিকে যথাসম্ভব ভোগ করতে পারে এবং এর ফলে যেমন তারা অনুভব করে যেমন মানুষের অনুভূতি অনুসারে মানব জীবনের আনন্দগুলিকে তারা ছুঁতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তারা এটি ঠিকভাবে বুঝতেই পারছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী উচ্চ বেতন ভোগ করে। কিন্তু যেহেতু এখানে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধান নেই — কোন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই—

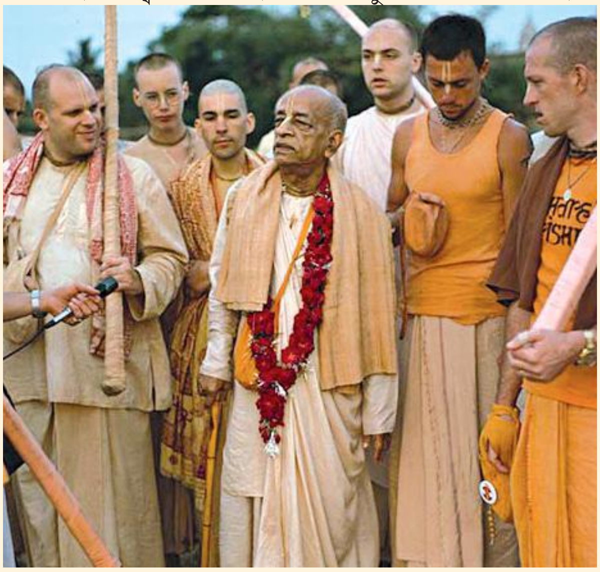

শ্রমিক শ্রেণী ভাবছে, 'এখন আমার কিছু টাকা আছে তাহলে কিভাবে এটা খরচ করব?' প্রায়ই তারা পানীয়ের উপর অপব্যয় করে। আপনি ভাবতে পারেন যে, আপনি শ্রমিক শ্রেণীকে ভালো জীবনের আশ্বাস দিচ্ছেন, কিন্তু যেহেতু তাদের দিকনির্দেশ করার জন্য কোন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই—সামাজিক দেহে কোন মস্তিষ্ক নেই — তারা তাদের অর্থ অপব্যয় করবে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।

মি. হেনিস — আচ্ছা, আমরা অপ্রত্যক্ষভাবে এর যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছি। যেমন আমি বললাম, আমরা মানুষকে কিভাবে অর্থব্যয় করবে তা বলি না। আমরা তাদের বলি না যে, কিভাবে তারা তাদের ফাঁকা সময়গুলি কাটাবে। আমরা চেষ্টা করি যাতে তারা আরামের জন্য যথাযথ সুবিধা পায়, যেমন সঠিক সুযোগ, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, ইত্যাদি, যদিও এগুলি আমাদের প্রাথমিক বিষয় নয়। কিন্তু যেটা আমরা করার চেষ্টা করি — এটা আপনার কাছে উৎসাহব্যঞ্জক মনে হবে — শ্রমিকদের শিক্ষাবিষয়ক একটি বড় পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আমরা শ্রমিকদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি কিভাবে আধুনিক শিল্পের সমস্যাকে বুঝতে হবে, কর্তৃপক্ষের সমস্যা, যে মানুষেরা দরাদরি করার সময় টেবিলের ওধারে রয়েছে, ব্যালান্স শিট পড়তে শেখা, অথবা কারখানায় বা কোম্পানীতে কর্তৃপক্ষ কিভাবে শ্রমিকদের থেকে অন্যরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়, অর্থনীতির প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি। এখন এটা পরিষ্কার যদি একজন পানীয়ের নেশা করতে চায় সে করবে। কিন্তু আমরা মনে করি ... আমরা পানীয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাব না যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এটি তার কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সেইজন্য অবশ্যই আমরা এটি নিয়ে চিন্তা করব।

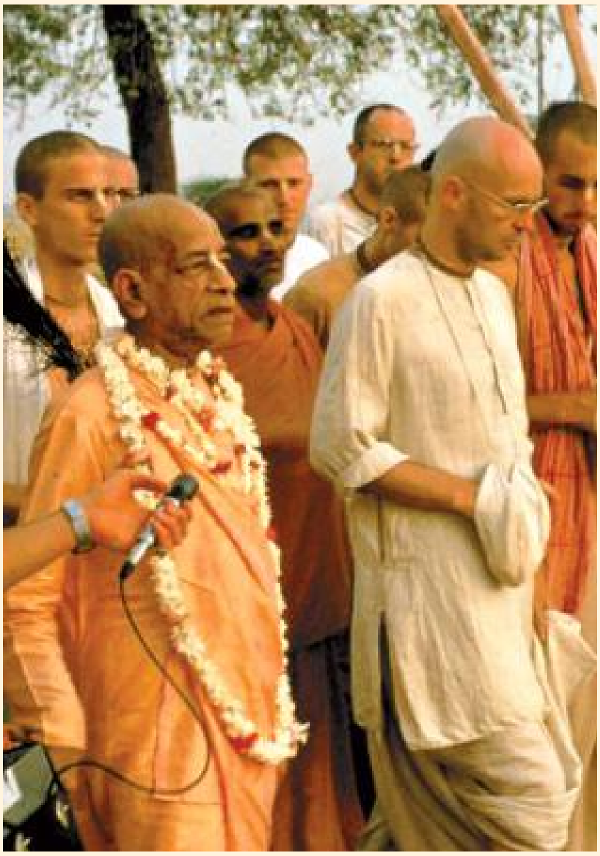

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভগবানকে সন্তুষ্ট করা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করা। একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তত্ত্বাবধান করুক যাতে শ্রমিকেরা বুদ্ধিদীপ্তভাবে কাজ করে এবং ভগবানকে উপলব্ধি করে।

শ্রীল প্রভুপাদ — না, সেটি বিষয় নয়। বিষয়টি হলো যে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, মস্তিষ্ক — সমাজের সকলকে দিকনির্দেশ করবে। সুতরাং মস্তিষ্ককে যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। এইটিই হলো বিষয়।

মি. হেনিস — আচ্ছা, আমি বলব, যে পর্যন্ত এগুলি চাকরীতে মানুষের উন্নতি, কার্যে উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং ট্রেড ইউনিয়নে নিজের সহকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতার উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে সচেতন। আমরা তার সাধারণ সাংস্কৃতিক উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, প্রকৃতপক্ষে শিল্প এবং ট্রেড ইউনিয়নের জীবন একজন শ্রমিকরূপে সম্বন্ধের উন্নতির বিষয়ে সচেতন। আমরা আশা করি এইরূপে একজন তার অবস্থার উন্নতি করতে পারে এবং অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে পানীয় ছাড়া অন্য অনেক বিষয়ে চিন্তা করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ — আমরা চাই শ্রমিকেরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করুক। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভগবানকে সন্তুষ্ট করা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করা। এই নয় যে, শ্রমিকেরা গাধার মতো বুদ্ধিহীনভাবে জীবনের উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধুই কঠোর পরিশ্রম করে যাবে। সব জন্তুর মধ্যে গাধা সব থেকে কঠোর পরিশ্রমী — কিন্তু সে তবুও জন্তু কারণ সে জানে না যে, কেন সে কাজ করছে। আপনি বুঝুন! কোনও বুদ্ধি নেই। আমরা এমন চাই না। আমরা চাই, একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তত্ত্বাবধান করুক যাতে শ্রমিকেরা বুদ্ধিদীপ্তভাবে কাজ করে এবং ভগবানকে উপলব্ধি করে। এটিই আপনার এবং আমাদের মধ্যেকার পার্থক্য।

ভগবানের লোভ

শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ গোস্বামী

লোভ অতিশয় মন্দ। কারণ জাগতিক বস্তুর প্রতি লোভীগণকে যন্ত্রণা পেতে হয়। এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি ছোট গল্প আছে।

এক লোভী বালক তার মাকে এক সরু মুখবিশিষ্ট মাটির পাত্রে জাম রাখতে দেখেছিল। জামের লোভে পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জাম পেল কিন্তু হাত সরু মুখে আটকে গেল। হাত টেনে বার করার চেষ্টা করতেই ব্যথায় সে কেঁদে ফেলল। ব্যথায় কাতর হলেও জাম ছাড়ল না। এই সহজ গল্পটির দ্বারা বোঝা যায় যে, লোভের ফল যন্ত্রণা। সেইজন্য ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বলছেন, 'লোভ পরিত্যাগ কর।'

কিন্তু লোভকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করা যায়। লোভ শব্দটি একটি প্রাচীন শব্দ, আধুনিক নয়। লোভের বীজ ভগবানের মধ্যেও আছে, আবার ভক্তের মধ্যেও আছে। ভগবদ্ভক্ত প্রসঙ্গে আমরা বলি, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। কিভাবে আপনি লোভকে ব্যবহার করতে পারেন? আরও অধিক সাধুসঙ্গ, ভক্তসঙ্গ, কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য লোভ বৃদ্ধি করুন। এই লোভ চিন্ময় এবং জড়প্রকৃতির গুণের অতীত। কখনোই একে পরিত্যাগ করা উচিত নয়; বরং আরও অধিকরূপে বৃদ্ধি করুন। এই প্রকার লোভ যত বৃদ্ধি পাবে আপনি আরও অধিক আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন করবেন এবং আপনার পারমার্থিক অগ্রগতি হবে। এই লোভে লোভী না হলে কেউ পারমার্থিক অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। সেইজন্য জড়লোভ ত্যাগ করুন কিন্তু চিন্ময় লোভ উৎপন্ন করুন।

পুনরায় বলা হয়েছে —

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোজপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।।

লৌল্য শব্দের অর্থ লোভ। এই শ্লোকের তাৎপর্য হলো এই যে, যদি আপনার এই প্রকার চিন্ময় লোভ থাকে তাহলে আপনি কৃষ্ণভক্তিরস, কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারবেন; নতুবা আপনি পাবেন না। আপনি এই রস লাভ করতে পারবেন। সুতরাং প্রত্যেকের অধিক সৎসঙ্গ এবং ভগবৎকথা শ্রবণের জন্য লোভ বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই ভজন সাধন এবং ভগবৎ সেবায় অগ্রসর হতে পারবেন। জড়জাগতিক মানুষ জানে না কিভাবে লোভকে ব্যবহার করতে হয়; তারা জড়সুখ ভোগ ও জড়বস্তু অধিকারের পিছনে এটি নষ্ট করে এবং যন্ত্রণা ভোগ করে। সেইজন্য যখন আমরা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রসঙ্গ বলি তখন আমরা এই লোভের কথা বলি না।

সূচনায় আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম কৃষ্ণের মধ্যে তিন প্রকারের লোভ উৎপন্ন হয়েছে যা তাঁর লীলাবিলাস কালে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতরণ করলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যের লীলাবিলাসকালে এই তিন প্রকারের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে।

লোভ শব্দটির ব্যবহার আশ্চর্যজনক। পূর্বে কখনো কেউ এই শব্দটিকে এইরূপে ব্যবহার করেছেন? কেউ না। কিন্তু

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী করেছেন। তিনি বলছেন যে, এই লোভের ফলে নন্দনন্দন (কৃষ্ণ) শচীনন্দন হলেন (চৈতন্য)। যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, স্বয়ং পূর্ণ, যাঁর কোন অভাব নেই, যাঁর কোন চাহিদা নেই, তথাপি লোভ উৎপন্ন হলো। আশ্চর্য! তিনি আত্মারাম। তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। তাহলে কেন এই লোভ? আপনাকে এই রহস্য, এর পিছনের সত্য জানতে হবে। যিনি আত্মারাম, যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দে পূর্ণ তাঁর লোভ হলো। এই লোভ কেমন ও কিসের জন্য?

পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে অভিলাষের বীজ উৎপন্ন হলো এবং তার ফল হলো গৌরাঙ্গ স্বরূপ, গৌরাঙ্গ রূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য। আমি এখন আপনাদের কাছে এর ব্যাখ্যা করছি।

চিন্ময়ধাম বৈকুণ্ঠের ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে লোভ উৎপন্ন হলো; তিনি মল্লযুদ্ধের অভিলাষ করলেন। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর মধ্যে ছয় প্রকারের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাঁর একটি ঐশ্বর্য হলো বল বা বীর্য। তাঁর অতুলনীয় বীর্য থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর যুদ্ধাভিলাষ হয় এবং তা পূরণ করতে চান। যখনই ভগবান কোন অভিলাষ পূরণ করতে চান, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া সেই অভিলাষ পূর্তির নিমিত্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সুতরাং বিষ্ণু যুদ্ধাভিলাষ করায় যোগমায়া সেই অভিলাষ পূরণের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করলেন।

এই প্রকার যুদ্ধে, বিপক্ষকেও অনুরূপ শক্তিশালী হতে হবে; নতুবা যুদ্ধের আনন্দ পাওয়া যায় না। সুতরাং কার সঙ্গে ভগবান যুদ্ধ করবেন? ভগবানের ইচ্ছায় এবং যোগমায়ার ব্যবস্থাপনায়, চিন্ময় ধামের দুই শক্তিশালী দ্বারপাল জয় এবং বিজয় তিন জন্ম দৈত্যকুলে জন্ম প্রাপ্তির অভিশাপ পেলেন। প্রথমে তারা হলেন হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু। তারপর রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ। অবশেষে শিশুপাল এবং দন্তবক্র। তিন অবতারে ভগবান বিষ্ণু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ উপভোগ করেছেন। এই হলো শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর লোভ।

এরপর নৃসিংহদেবের লোভ। নৃসিংহদেবের দুই রূপ উগ্র (ভয়ঙ্কর) এবং অনুগ্র (শান্তিময়)। হিরণ্যকশিপু বধের পর নৃসিংহদেবের রূপ ছিল ভয়ঙ্কর এবং তিনি ধ্বংসের সময় ভগবান শিবের নৃত্যের মতো নৃত্য করছিলেন। সমগ্র বিশ্ব সেই উগ্র নৃত্য দেখে কম্পিত হচ্ছিল। সকল দেবতাগণ তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে স্তব করছিলেন কিন্তু তারা বিফল হলেন। তারপর দেবতাগণ ভক্ত প্রহ্লাদকে অনুরোধ করলেন, 'দয়া করে যাও এবং ভগবান নৃসিংহদেবের ক্রোধ শান্ত কর।' প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের প্রিয় ভক্ত, সুতরাং প্রহ্লাদ তাঁর স্তব করলে ভগবান নৃসিংহদেব শান্ত হলেন এবং তাঁর শান্তিময় রূপ প্রকাশ করলেন। তারপর ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদকে পুত্রের ন্যায় তাঁর কোলে বসালেন এবং ভগবান নৃসিংহদেবের মধ্যে বাৎসল্য প্রেম, পিতামাতার স্নেহ এবং ভালোবাসা উৎপন্ন হলো।

পিতা এবং পুত্র উভয়েরই এই রস মাধুর্য আস্বাদন করলেন। যেহেতু পুত্র পিতার কোলে বসেছে, পিতাও তৃপ্তি পেলেন, পুত্রও তৃপ্তি পেলেন। এই পরিতৃপ্তি পারস্পরিক। কিন্তু পুত্র পিতার থেকে অধিক রস আস্বাদন করেছেন। সুতরাং নৃসিংহদেবের একটি লোভ উৎপন্ন হলো — 'কিভাবে আমি আমার পিতার কোলে বসে এই রস আস্বাদন করতে পারি?' সেই থেকে নৃসিংহদেবের পরে, ভগবানের সকল অবতারেই তিনি এই অভিলাষ পূরণের জন্য একজন পিতা এবং মাতা গ্রহণ করেছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে অভিলাষের বীজ উৎপন্ন হলো এবং তার ফল হলো গৌরাঙ্গ স্বরূপ, গৌরাঙ্গ রূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য। আমি এখন আপনাদের কাছে এর ব্যাখ্যা করছি।

ভগবান রামেরও লোভ হয়েছিল। বিভীষণ এবং সুগ্রীব ছিলেন রামের বন্ধু। এর অর্থ ভগবান রামের লীলাবিলাসে সখ্যরস, বন্ধুসুলভ প্রীতি ছিল। কিন্তু দুই ধরনের সখ্যরস আছে সম্ভ্রম (ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্ব) এবং বিশ্রম্ভ (সমভাবে বন্ধুত্ব সেখানে ভয় ও শ্রদ্ধা অনুপস্থিত)। ভগবান রামের লীলাবিলাসে সাম্যের কোন স্থান ছিল না। তাঁর বন্ধু সুগ্রীব এবং বিভীষণের পক্ষে তাঁর কাঁধে চড়া এবং তাঁর মুখ থেকে খাবার কেড়ে নেওয়া অসম্ভব ছিল। ভগবান রামের দেহে তাদের চরণ স্পর্শ হয়ে যেতে পারে এই ভয়েও তারা ভীত ছিলেন, কারণ তারা একে অপরাধ বলে ভাবতেন। তাদের সখ্যতা ছিল সম্ভ্রম সখ্য, ভয় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্ব।

কিন্তু বিশ্রম্ভ সখ্য পৃথক। বিশ্রম্ভ সখ্যে এমন ভালোবাসা ও প্রেম থাকে যে, সখাগণ মনে করে তারা ভগবানের সমান। এখানে ভয় ও শ্রদ্ধার কোন স্থান নেই, কৃষ্ণলীলায় এই বিশ্রম্ভ সখ্য দেখতে পাওয়া যায়। গোপবালকগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করে তাঁর মুখ থেকে খাদ্য কেড়ে নিত এবং কৃষ্ণও তাদের মুখ থেকে খাদ্য কেড়ে নিতেন। গোপবালকদের চরণ

কৃষ্ণের দেহ স্পর্শ করত এবং কৃষ্ণ এতে বিরক্ত হতেন না কারণ সেগুলি যেন তাঁরই চরণ ছিল এমন ভাব করতেন। যদি আপনার পা আপনার দেহ স্পর্শ করে তা কি আপনাকে বিরক্ত করে? সেখানে কোন সমস্যাই নেই কারণ অন্যের নয় আপনার নিজের পা। সুতরাং এই গোপবালকগণ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেইজন্য এখানে সাম্য এবং অভিন্ন। (অপৃথকত্ব) ছিল।

কিন্তু ভগবান রামের লীলাবিলাসে এই প্রকারের সখ্যরস আস্বাদিত হয়নি। সেইজন্য ভগবান রামের লোভ হলো এর জন্য— 'কিভাবে আমি এটি আস্বাদন করতে পারি?' কৃষ্ণ অবতারে তাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ হলো।

অপর একটি সম্বন্ধ হলো মাধুর্য রস। রাম অবতারে ভগবান রাম হলেন মর্যাদা-পুরুষোত্তম। এর অর্থ তিনি যে কঠোরভাবে বৈদিক রীতি নীতি অনুসরণ করতেন, কখনো তা অতিক্রম করেননি। একপত্নীধারা তিনি এক পত্নী গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য যদিও তাঁর লীলাবিলাসে দাম্পত্য রস, মাধুর্য রস ছিল কিন্তু তা পূর্ণরূপে আস্বাদন করা যায়নি। এই রসের সার আস্বাদন করা যায়নি। এই দাম্পত্য রস পূর্ণরূপে আস্বাদিত হয় যেখানে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে মিলন ও বিরহ থাকে। রামলীলায় রাবণ সীতাকে হরণ করে এবং ভগবান রাম তাঁর প্রজাদের সুখের জন্য সীতাকে নির্বাসিত করেন। সুতরাং রাম ও সীতার মিলন ও বিরহ হয়েছিল। কিন্তু এই প্রকারের বিরহে কোন বৈচিত্র ছিল না। এটি স্বাভাবিক নয়, বলপূর্বক হয়েছিল। সুতরাং সেখানে দাম্পত্য রসের মাধুর্য আস্বাদনের প্রশ্ন ছিল না।

রূপ গোস্বামী তার উজ্জল-নীলমণি গ্রন্থে বিবিধ প্রকার বিরহের কথা উল্লেখ করেছেন পূর্বরাগ বিরহ, মান বিরহ, প্রেমবৈচিত্র বিরহ। ভগবান রামের লীলাবিলাসে এই প্রকার বৈচিত্র ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণের লীলাবিলাসে তা ছিল। সেইজন্য ভগবান রামের এগুলি আস্বাদন করার লোভ হয়েছিল। কৃষ্ণাবতারে সেই অভিলাষ পূর্ণ হলো।

প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে বিরহ হলো প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে নায়ক এবং নায়িকা, প্রেমিক এবং প্রেমিকা তাদের হৃদয়ের ভাব আস্বাদন করেন। সেইজন্য কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণ হলেন রাধাকান্ত (রাধারাণীর পতি) এবং গোপীকান্ত (গোপীগণের পতি)। কিন্তু রাধা এবং গোপীগণ তাঁর নিজ পত্নী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরকীয়া রস আস্বাদন করার জন্য তাদের অন্যের পত্নী করেছেন।

রামলীলায় শুধুমাত্র স্বকীয় রস অর্থাৎ নিজপত্নীর প্রেম আস্বাদিত হয়েছে, পরকীয়া রস নয়। ভগবান রাম সেইহেতু পরকীয়া রস আস্বাদনের লোভ করেছেন। সেই পরকীয়া রস আস্বাদন করতে কৃষ্ণ তাঁর নিজ পত্নীদের অপরের পত্নী করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং রামলীলায় যে লোভ অপূর্ণ রয়ে গেছে কৃষ্ণলীলায় তা পূর্ণ হয়েছে।

এইরূপে লোভই ভগবানের বারংবার অবতার গ্রহণের কারণ।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি কৃষ্ণলীলায় তিন প্রকারের লোভের প্রসঙ্গ —

প্রথম লোভ হলো ঃ রাধারাণীর প্রেম কেমন এবং কিভাবে আমি তা আস্বাদন করব? দ্বিতীয় লোভ ঃ আমার অসাধারণ সর্বাকর্ষক রূপ কেমন? আমি নিজেকে আস্বাদন করতে পারি না। কিভাবে আমি তা পারব? এবং তৃতীয় লোভ ঃ আমার এই অসাধারণ সর্বাকর্ষক সৌন্দর্য আস্বাদন করে রাধারাণী কি আনন্দ অনুভব করেন? কিভাবে আমি তা পাব? কৃষ্ণলীলায় এই তিন প্রকারের লোভ অপূর্ণ রয়ে গেছে। সেইজন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হলেন। এই তিন প্রকারের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত ঈশান্তরঙ্গকরণম, এই অন্তর্নিহিত কারণেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের অবতরণ।

প্রশ্ন ১। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই কথা উল্লেখ রয়েছে। আমরা এই সব অনুশীলনের মধ্যে আছি। কিন্তু আমাদের তো কৃষ্ণপ্রেম জন্মাচ্ছে না। কেন?

—ব্রজেশ্বর মাধব দাস, নদীয়া

উত্তর ঃ ভক্তদের সেবা করা হচ্ছে। হরিনাম কীর্তন হচ্ছে। ভাগবতকথা আলোচনা হচ্ছে। ভগবৎ-লীলাভূমিতে বাস করা হচ্ছে। শ্রদ্ধা যত্ন সহকারে অর্চাবিগ্রহও সেবিত হচ্ছেন। এই পঞ্চ সাধন-অঙ্গ অল্প সাধিত হলেও আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হবে। এই কথা মিথ্যা নয়।

এখানে নিরপরাধ ব্যক্তির হৃদয়ে সুপ্ত প্রেম জাগ্রত হবার কথা বলা হয়েছে। সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে । (চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২২। ১৩৩) সৎ-ধিয়াং — যারা বুদ্ধিমান এবং অপরাধশূন্য, ভাব-জন্মনে — তাদের হৃদয়ে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়। নাম অপরাধ, ধাম অপরাধ, গুরু অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ, কিংবা সেবা অপরাধ থাকলে সুপ্ত প্রেম জাগবে না।

সাধু সেবায়, নামকীর্তনে, ভাগবত শ্রবণে, ভগবৎ লীলাভূমিতে বসবাসে, অর্চাবিগ্রহ সেবায় যখন শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি আসে তখন প্রেমের প্রথম অবস্থা বা ভাব আসে। সেই সময়ে সাধকের বাহ্য লক্ষণ হলো তার শরীরে পুলক (রোমাঞ্চ) অশ্রু (দুই নয়নে জল ঝরতে থাকে) অক্ষুব্ধ চিত্ত (ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ হয় না), প্রতিনিয়ত কৃষ্ণস্মরণ করে। এমন নয় যে, কিছুক্ষণ কৃষ্ণনামে মেতে গেল, তারপর কৃষ্ণবহির্মুখ হয়েই চলল। কৃষ্ণভক্তি প্রতিকূল বিষয়ে সর্বদাই সে বিরক্ত, সম্মানীয় হয়েও কারও কাছে সম্মান আশা করে না। আমি বড় — এই অভিমান তার নেই। সে কেবল অন্তরে এই আশা করে থাকে 'কৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে কৃপা করবেন।' আর সেই জন্যে সে দিনরাত ব্যাকুল অন্তরে কৃষ্ণসেবায় যুক্ত থাকে। কৃষ্ণভক্তি আচারে-প্রচারে যুক্ত থাকে। হরিনাম গানে তার রুচি, কৃষ্ণমহিমা আলোচনাতে তার অত্যন্ত আসক্তি, কৃষ্ণলীলাস্থলীর প্রতি তার প্রীতি থাকে।

তুষ্টমনাঃ স্পৃহা-মদ-শূণ্য, বিমৎসর।
জীবন যাপন করে কৃষ্ণেচ্ছা তৎপর।।

তুষ্টমনা (সরলভাবে জীবন যাপন করে), স্পৃহামদশূণ্য (নানাবিধ জড় চাহিদা তার থাকে না), বিমৎসর (কারও প্রতি ঈর্ষা করে না, কারও পেছনে লাগে না), কৃষ্ণেচ্ছা তৎপর (কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সুখে-দুঃখে শান্ত চিত্তেই কৃষ্ণকেই স্মরণ করে থাকে)।

প্রশ্ন ২। 'তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ'। আবার বলা হচ্ছে, 'গৌর আমার যেসব স্থান করিল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে।।' এই দুই রকম কথা বুঝিয়ে বলুন?

—ব্রজেশ্বর মাধব দাস, নদীয়া

উত্তর ঃ এখানে তীর্থযাত্রা বলতে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও নীলাচল প্রভৃতি অভীষ্ট ভগবৎধাম ছাড়া অন্যান্য তীর্থে গমন করাকে বোঝানো হয়েছে। যারা শ্রীভগবানের চরণকমলে প্রেম লাভ করতে চায় তাদের পক্ষে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন বা পুরীধাম আশ্রয় করে সজাতীয় সাধুদের সঙ্গে ভক্তি অনুশীলনে নিয়ত থাকতে হবে। নানা তীর্থে যাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে না। কারণ, নানাতীর্থ ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে চিত্ত চঞ্চল হবে। তার ফলে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ প্রভৃতি

ভক্তিঅঙ্গগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে ভজন করতে সমর্থ হবে না। নানা হুটোপাটিতে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সরল স্বাচ্ছন্দ্যময় নাও থাকতে পারে। 'তীর্থযাত্রা পরিশ্রম'। আমরা হয়তো ভাবতে পারি, তীর্থে ঘুরে ঘুরে আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ নির্মল হবে। কিন্তু না। 'কেবল মনের ভ্রম' — বরং এত ঘোরাঘুরি পরিশ্রম না করে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ-কীর্তন, পূজা, কৃষ্ণকথা আলোচনা, কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন, শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও সেবাকার্য মাধ্যমে সর্ব সিদ্ধি লাভ হবে। অনর্থক দূর-দূরান্তে ঘুরবার দরকার নেই। 'সর্ব সিদ্ধি গোবিন্দ চরণ'।

তবে ভগবানের লীলাস্থলী দর্শন করাও ভক্তির একটি অঙ্গ। ভগবানের ভ্রমণ লীলাস্থলী, ভগবানের প্রিয় ভক্তের স্মৃতিস্থান দর্শন করাটাও মাহাত্ম্য পূর্ণ। গৌর আমার যে সব স্থান করিল ভ্রমণ রঙ্গে। কিন্তু সেই সমস্ত স্থান দর্শন তখনই সার্থক হবে যখন সংশ্লিষ্ট স্থানে আন্তরিকভাবে ভগবান ও ভক্তের মহিমা আলোচনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা হয়। যে সব ব্যক্তিরা সেসব আলোচনায় মন রাখতে অভ্যস্ত নয়, কেবল নিজ নিজ জড় সুখ-সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত এবং তর্ক করতে অভ্যস্ত, তাদের সঙ্গে তীর্থে গিয়ে কোনও লাভ নেই। যারা প্রীতিভাবাপন্ন ও বিনয়ী, যারা ভগবৎ প্রসঙ্গে কৌতূহলী, তাদের সঙ্গেই ভগবৎলীলাস্থলী দর্শন আনন্দদায়ক হয়। 'সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে।।'

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রেমপূর্ণ শরণাগতি

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বশেষ নির্দেশ হলো শ্রীকৃষ্ণের নিকট সর্বান্তকরণে শরণাগতি, একথা শুনে আমার বন্ধু বিরক্ত হলেন। 'আমি কি একজন অপরাধী যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে? এর থেকে কোন বিনয়ী, কোমল একজন ভগবানের অর্চনা করা শ্রেয়!'

আত্মসমর্পণ শব্দটি আমাদের মনে সাধারণত কোন সদর্থে প্রতিভাত হয় না। যেহেতু শব্দকোষ নির্দেশ করে যে, আত্মসমর্পণের সঙ্গে পরাজয়, হতাশা এবং গর্ব ও সম্মান হানি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যখন কোন সৈন্যদল শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে তা সেই জাতির কাছে অত্যন্ত অসম্মানকর। একজন অপরাধী অথবা উগ্রপন্থীকে জোর করে আত্মসমর্পণ করানো হয় কারণ সে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই যে, বিজয়ী অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বিজিতকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য বলপ্রয়োগের দ্বারা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, আর পরাজিত পক্ষ প্রতিশোধ নেবার জন্য একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে আত্মসমর্পণের কথা বিবৃত হয়েছে তা জীবন যুদ্ধে একজন পরাজিতের বলপ্রয়োগ দ্বারা আত্মসমর্পণের থেকে পৃথক। ভগবদ্গীতার নির্দিষ্ট কিছু শ্লোক, পঠন আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন অহঙ্কারী ভগবান। কিছু শ্লোক রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নেতার মত শোনায় যে, ক্ষমতায় এলে ভোটারদের সকল দুঃখের অবসান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন রাজনৈতিক নেতা নন যে, তিনি তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত হবেন। তাঁর আত্মসমর্পণের আহ্বান কোন শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারী দাবী নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে সকল জীবাত্মার প্রতি তাঁর করুণার প্রকাশ।

সকল দুঃখ নিবারণের মহৌষধ

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে না। সকল বৈদিক শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। কতিপয় উদাহরণ ঃ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ — 'কৃষ্ণ যিনি গোবিন্দ রূপে পরিচিত, তিনিই পরমেশ্বর' (ব্রহ্ম সংহিতা ৫।১); কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ — 'শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান' (ভাগবত ১।৩।৩৮) 'দেবকী পুত্রই (কৃষ্ণ) হলেন পরমেশ্বর' (নারায়ণ উপনিষদ ৪)। এমনকি কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পরমেশ্বরতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ মত্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় — 'হে ধনঞ্জয়! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।' (ভগবদ্গীতা ৭।৭)

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা এবং সর্বাধিক সুন্দর ধারণা। এর অর্থই হলো তাঁর প্রতি সম্পূর্ণভাবে আমাদের প্রেম নিবেদন। যারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভালোবেসে আত্মসমর্পণ করতে নারাজ তাদেরকেও মৃত্যুকালে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু

হলো সেই অস্ত্র যার দ্বারা শক্তিশালী সময় আমাদের শ্বাসরোধ করে। জগতের সকল মহান সম্রাট --- আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার, ঔরঙ্গজেব — বলবান সময়ের দ্বারা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। যত পরিমাণে আমরা নিজেকে জগতের অধীশ্বর এবং নিয়ন্ত্রকরূপে কল্পনা করব, মৃত্যুরূপে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আমরা তত পরিমাণেই কষ্ট পাব। সেই আত্মসমর্পন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং ভয়ানক।

অপরপক্ষে যদি আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে আমাদের নিত্য পরিচয়কে অনুভব করি এবং বিনম্রতার সঙ্গে তা স্বীকার করি, আমাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হবে। শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে ভক্তকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেবেন।

আমরা যদি কৃষ্ণের দিকে এক পা এগোই, তিনি আমাদের দিকে শত পা এগোবেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা আমাদের উপর তাঁর স্নেহধারা বর্ষণ করে আমাদের আনন্দে রাখতে চান। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।' (গীতা ৮।৬৬)

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য অপেক্ষারত

আমি ভাবি যদি আমার বন্ধু উপলব্ধি করতে পারত কিভাবে সর্বশক্তিমান হয়েও ভগবান এত করুণাময়। কল্পনা করুন লক্ষপতির অধীনস্ত এক কর্মচারী যদি তার মালিকের বিরোধিতা করে তাঁকে অমান্য এবং হেয় করে, মালিক কি তাকে সহ্য করবে?

প্রেমপূর্ণ আত্মসমর্পণ

আশ্চর্যজনকভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাই করেন। তিনি বিদ্রোহী আত্মাদের তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দেন এবং তাদের জন্য জড়জগত সৃষ্টি করেন যাতে তারা তাদের ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষের পরিতৃপ্তি করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সহ্য করেন এবং এই আত্মাসকল নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর দিকে প্রত্যাগমনের মুহূর্তটির জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের সঙ্গে তাঁর

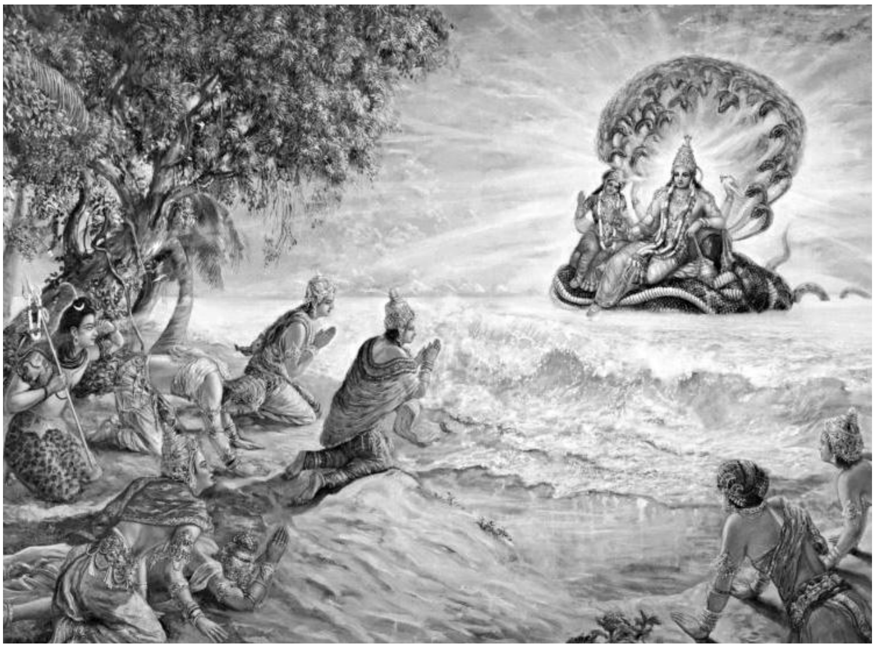

আত্মসমর্পণের সৌন্দর্য

আমার বন্ধু আত্মসমর্পণ শব্দটিকে ঘৃণা করে কারণ সে ভাবে যে, সে অপরাধী নয়। কিন্তু চিন্ময় জগতের আইন অমান্যকারীরূপে আমরাও অপরাধ করেছি। সৌভাগ্যক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি করুণাময় এবং তিনি ব্যগ্রভাবে চান যে, আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাগমন করি।

আমাদের প্রকৃত পিতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ আমাদের পক্ষে কখনোই অসম্মানজনক নয়। কৃষ্ণের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ যেন চিকিৎসকের কাছে আরোগ্যের জন্য রোগীর আত্মসমর্পণ অথবা মায়ের কাছে এক শিশুর আশ্রয়গ্রহণ। এক রোগী নিজের উপকারের জন্য চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশান মেনে চলে। একজন শিশু মায়ের কোলেই স্নেহ ও যত্ন পায়। আমাদের মুক্তির জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই উদাত্ত আহ্বান।

লীলাবিলাস সুস্পষ্টভাবে তাঁর বিনম্রতাকে প্রকাশ করে। একদা তাঁর বাল্যসখা সুদামা দ্বারকায় তাঁর দর্শনে এসেছিলেন, দরিদ্রতাবশতঃ সুদামার পরিধেয় বস্ত্র যথার্থ ছিল না।

তার বস্ত্র ছিন্ন এবং অপরিষ্কার ছিল এবং তিনি খুব দুর্বল ছিলেন। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতে পারলেন যে, তাঁর সখা সুদামা এসেছেন, তিনি তাঁর প্রাসাদ থেকে সত্তর তাঁর সখাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ছুটে গেলেন। তিনি তাঁর সখাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর পালঙ্কে তাকে বসালেন। তিনি সুদামার পদধৌত করে স্বয়ং তাকে ফল ও পানীয় নিবেদন করেন।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ রাজকীয় যাদব কুলোদ্ভুত ছিলেন তিনি কখনও তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ সখাকে ভুলেননি। তিনি সমকক্ষ রূপে সুদামার পরিচর্যা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সারথীরূপে বিখ্যাত, তিনি স্বয়ং ভগবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভক্তের জন্য এরূপ নিম্নপদ গ্রহণ করতে সঙ্কোচ করেননি।

এভাবে আমরা দেখি সমগ্র বিশ্বচরাচরের সর্বোচ্চ অধীশ্বর স্রষ্টা এবং প্রভু তাঁর ভক্তদের সেবার জন্য ব্যগ্রভাবে সাধারণ পদ স্বীকার করেন। জাগতিক ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

আমাদের উদ্ধত ব্যবহার সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুনঃ আমাদের গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন এবং ব্যগ্রভাবে আশা করেন যে, একদিন আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় চিন্ময় ধামে ফিরে যাব।

সবাই আত্মসমর্পণ করে না; শ্রীকৃষ্ণ তা জানেন — 'বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।' (গীতা ৭। ১৯) যদি আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে না থাকি, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে আমরা কৃষ্ণেরই জড়জাগতিক মায়া শক্তির সঙ্গে থাকব। সুতরাং হয় কৃষ্ণ নয় তাঁর জড় শক্তি যেভাবেই হোক আমাদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমাদের জীবনে সাফল্য আসবেই, দুঃখ এবং উদ্বেগের কোন চিহ্নই সেখানে থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণে এক আনন্দময় নিত্য জীবনের জন্য দ্বার খুলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমরা প্রতিদিন আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের অনুশাসনের কাছে, আমাদের অপূর্ণ অভিলাষের কাছে, দৈহিক দাবীর কাছে এবং বহু লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করি। আমার বন্ধুটি একজন ধূমপায়ী, প্রতিদিন আধাডজন সিগারেট খান। তিনি বুঝতেই পারেন না যে, তিনি জীবন হানিকারক নেশার কাছে আত্মসমর্পন করেছেন।

মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং এইরূপে মহান জয় লাভ করেন।

অর্জুন বলেন, 'হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে এবং যথাজ্ঞানে অবস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব।' (ভগবদ্গীতা ১৮। ৭৩) অর্জুনের মতো ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে যারা শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তদের নির্দেশ পালন করে অবিশ্বাস্য যশ এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমাদের জীবনে সাফল্য আসবেই, দুঃখ এবং উদ্বেগের কোন চিহ্নই সেখানে থাকবে না।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণে এক আনন্দময় নিত্য জীবনের জন্য দ্বার খুলে যায়। 'যিনি জড় জগতের আশ্রয় স্বরূপ এবং মূঢ় দানবের শত্রু মুরারিরূপে খ্যাত, সেই ভগবানের পাদপদ্মরূপ নৌকায় যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে এই ভব সমুদ্র গোষ্পদতুল্য। বৈকুণ্ঠ লাভই তাদের লক্ষ্য। পদে পদে বিপদসঙ্কুল এই জড়জগৎ তাঁদের জন্য নয়।' (ভাগবত ১০। ১৪। ৫৮)

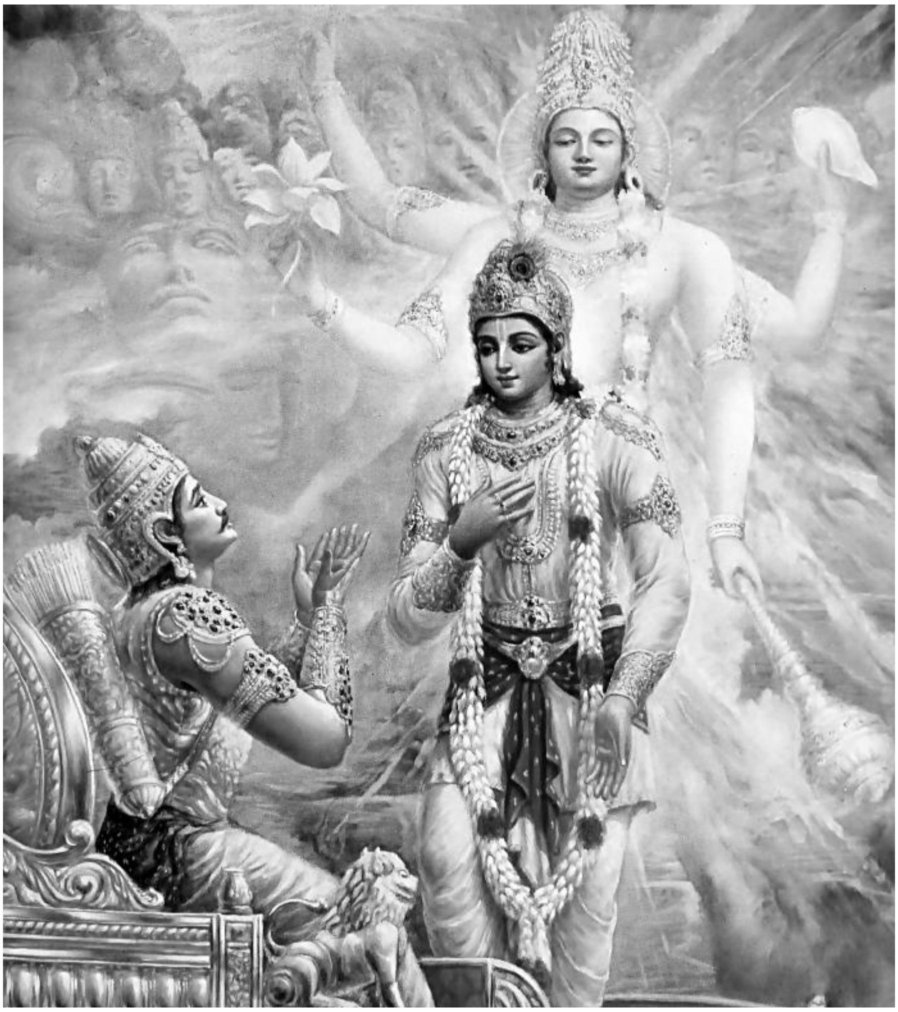

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

ইসকন নেতৃবৃন্দ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন

ইসকন নিউজ ঃ ইসকনের জিবিসি এবং ইন্ডিয়া ব্যুরোর চেয়ারম্যান গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী ইসকন কমিউনিকেশনের প্রধান যুধিষ্ঠির গোবিন্দ দাসের সঙ্গে সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার নতুন দিল্লী স্থিত সরকারী বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে যান।

ভারতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইসকন যে সকল বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সে বিষয়ে গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করান। মধুসেবিত দাসের নেতৃত্বে যে উৎস্বর্গীকৃত ভক্তদল বিশ্বের বৃহত্তম ভগবদ্গীতাটি ইটালিতে অলঙ্করণ এবং মুদ্রণ করেছেন সেটিকে উন্মোচিত করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মোদী এই সংস্করণের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন যে, এটি অবশ্যই একটি 'স্মরণীয় কর্মকান্ড'। নতুন দিল্লীতে এই গ্রন্থ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির বিশদ কাজ এখন চলছে।

ইসকন নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীকে মায়াপুরের বৈদিক তারামন্ডল মন্দিরের নির্মাণ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে ইসকনের ট্রাইবাল কেয়ার ইনিশিয়েটিভ সম্বন্ধে অবহিত করান যেগুলি শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং পরবর্তীতে এগুলি উন্নতির জন্য পরামর্শও দেন।

যুধিষ্ঠির গোবিন্দ দাস বলেন, 'সামগ্রিকভাবে এই সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত আন্তরিক ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী সবার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ইসকন সদস্যদের সেবাকার্যকে অব্যাহত রেখে আরও বিস্তৃত করতে বলেন।'

মনোমুগ্ধকর শারদ পূর্ণিমা উৎসবে লন্ডনের ভক্তরা সম্মোহিত

ইসকন নিউজ ঃ ২৪ অক্টোবরের সন্ধ্যায় সমগ্র লন্ডন থেকে ভক্ত মন্ডলী শরতের সুন্দর পূর্ণিমা স্নাত রাতে শারদ পূর্ণিমা উদযাপন করার জন্য সেন্ট্রাল লন্ডনের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে জমায়েত হয়েছিলেন। শারদ পূর্ণিমা কার্তিক মাসের ঠিক প্রথমেই পালিত হয় যাতে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তম ভক্ত বৃন্দাবনের গোপকুমারীদের সাথে যে অপূর্ব 'রাসলীলা' নৃত্য করেছিলেন তাকে স্মরণ করার জন্য।

সন্ধ্যার শুরুতেই আবাসিক সাধু দয়ালমোর দাস পবিত্র কার্তিক মাস উদযাপন সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। লেসেস্টার ইসকন থেকে আগত কীর্তনীয়া, চৈতন্য চিন্তামণি দেবীদাসী

দামোদর অষ্টকম্ প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন। এর পরে বিভিন্ন কীর্তন সম্প্রদায়ের সুন্দর কীর্তন পরিবেশনা দর্শকদের মধ্যে ভগবানের উদ্দেশ্যে রাত্রি নটার সময় বিশেষ দীপদান অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আগ্রহান্বিত করে।

পর্দা উন্মোচনের পর ভক্তগণ শ্রীশ্রীরাধালন্ডনেশ্বর, শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানী, শ্রীগিরিগোবর্ধন এবং শ্রীশ্রীগৌরনিতাই এর শ্রীবিগ্রহের চমৎকারী নৈশদর্শন আস্বাদন করেন। সম্প্রদায় সদস্য বংশীবট দাস দ্বারা অলঙ্কৃত ঐশ্বর্যময় জমকালো নতুন বেশে তাঁদের সজ্জিত করা হয়েছিল।

তাজা ফুলের মালা এবং ঝকমকে অলঙ্কারে সজ্জিত অপূর্ব শ্রীশ্রী রাধালন্ডনেশ্বরের সঙ্গে বংশীবট দাসের অঙ্কিত তাঁদের চারজন প্রধান গোপিকাও অবস্থান করছিলেন। বেদীটি ঘৃতের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত এবং পুষ্পদ্বারা সজ্জিত থাকায় বৃন্দাবনের তারকাখচিত পূর্ণিমার রাত্রিকে লন্ডনে অনুভব করা যাচ্ছিল।

এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশ আরও মোহময় হয়ে উঠেছিল সুরেলা কীর্তনে যখন ভক্তগণ ১৯৬৯ সালে শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তে স্থাপিত ইসকনের প্রথম বৃহৎ মার্বেলের রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহের বিশেষ দর্শনে নিমগ্ন ছিলেন।

মাসিক সংকীর্তন উৎসব নিউইয়র্কের ভক্তদের একত্রিত করেছে

মাধব দাস ঃ বৃহত্তর নিউইয়র্ক অঞ্চলের — কুইন্স এবং ভক্তি সেন্টার মন্দিরগুলি এবং কানেকটি কাট থেকে প্রায় সত্তরেরও বেশি ভক্ত বহুবর্ষব্যাপী উদযাপিত নিউইয়র্কের মাসিক সংকীর্তন উৎসবে এই প্রথম অংশগ্রহণ করল।

সপ্তাহ শেষে ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তাদেরকে গ্রন্থ বিতরণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং তারা নিজেরা প্রভুপাদের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নে গভীরভাবে মগ্ন ছিল। অনেকেই গ্রন্থবিতরণ বিষয়ে একদম নবীন ছিলেন এবং যোগ্য তত্ত্বাবধানে থেকে কার্যকরী পরিকাঠামোর মধ্যে তথা কিভাবে কাজটি সম্পাদন করবেন তা সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহিত ছিলেন।

সংকীর্তন প্রকল্প পরিচালক বৈশেষিক দাসের মস্তিষ্ক প্রসূত ইসকনের মাসিক সংকীর্তন উৎসব ২০০৭ সালে সিলিকন ভ্যালীতে শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে এটি আমেরিকা, কানাডা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে বিস্তার লাভ করেছে।

বৈশেষিক দাস বলেন, 'আমি বহুবছর ধরেই নিউইয়র্কে এটি পুনরায় করার কথা ভাবছিলাম কারণ MSF শুধুমাত্র গ্রন্থ বিতরণ অথবা সংকীর্তন উৎসবের থেকে অনেক বেশী— এটি সমগ্র সম্প্রদায়কে একত্রিত করে। সমস্ত ভক্তদের একত্রিত করার জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্য, একটি ব্যবহারিক সেবা প্রকল্প থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থ বিতরণ হলো আদর্শ। কারণ এটির ওপর শ্রীল প্রভুপাদ এবং আমাদের সম্প্রদায় অত্যন্ত জোর দিয়েছেন এবং প্রত্যেকেই এটিকে একটি মূল্যবান কারণ বলে মনে করে।'

'হরিনাম পার্টি বাস' বুয়েনার্স এয়ারসে আগমন করল

মাধব দাস ঃ ২৭ অক্টোবর শনিবারে 'হরিনাম পার্টি বাস' আর্জেন্টিনার বুয়েনার্স এয়ারস শহরের নাগরিক জীবন আলোকজ্জ্বল করল।

এই ভাবনাটি বহুদিন ধরে ছিল এবং অবশেষে গতমাসে এটি বাস্তবায়িত হলো। এটি প্রেমরূপ মাধব দাস প্রভু এবং প্রেমরূপিনী মাধবী দাসী এই দম্পতির মস্তিষ্ক প্রসূত। বুয়েনার্স এয়ারসের মন্দিরের বোর্ডে দুজনে এক সঙ্গে কাজ করেছেন এবং ফুড ফর লাইফ ও সাপ্তাহিক হরিনাম প্রকল্প দুটি পরিচালনা করতেন।

হরিনাম পার্টি বাস অনুষ্ঠানের জন্য তারা দুটি বড় স্কুল বাস ভাড়া করে পতাকা দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন যাতে লেখা ছিল, 'জপ করুন এবং সুখী হউন।'

১১৫ জন ভক্তের জমায়েতে ব্রহ্মচারী, যুবদম্পতি পরিবার এবং বর্ষিয়ান ভক্তরা ছিলেন। প্রথমে তাঁরা মধ্যাহ্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং তারপর তাদের রাবার ব্যান্ড ব্রেসলেট দেওয়া হয় যাতে লেখা ছিল 'হরে কৃষ্ণ' এবং 'হরিনাম পার্টি বাস'।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

৫৩৩ গৌরাব্দ

২০১৯ — ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ১৪২৫ — ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

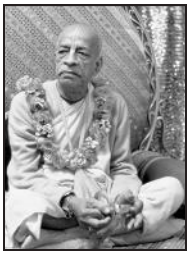

২২ মার্চ (২০১৯) ৭ চৈত্র ১ বিষ্ণু শুক্রবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ উৎসব।

২৮ মার্চ ১৩ চৈত্র ৭ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পন্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

১ এপ্রিল ১৭ চৈত্র ১১ বিষ্ণু সোমবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ পাপমোচনী একাদশী ও উন্মীলনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২ এপ্রিল ১৮ চৈত্র ১২ বিষ্ণু মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২৮ থেকে সকাল ৮-৪০ মধ্যে। শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। অগ্রদ্বীপ মেলা।

৫ এপ্রিল ২১ চৈত্র ১৫ বিষ্ণু শুক্রবার অমাবস্যা।

১০ এপ্রিল ২৬ চৈত্র ২০ বিষ্ণু বুধবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামানুজ আচার্যের আবির্ভাব তিথি।

১৪ এপ্রিল ৩০ চৈত্র ২৪ বিষ্ণু রবিবার নবমী ঃ শ্রীরাম নবমী মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। মেষ সংক্রান্তি।

১৫ এপ্রিল ১ বৈশাখ (১৪২৬) ২৫ বিষ্ণু সোমবার দশমী ঃ তুলসী-শালগ্রামে জলধারা দান আরম্ভ।

১৬ এপ্রিল ২ বৈশাখ ২৬ বিষ্ণু মঙ্গলবার শুক্লা একাদশী ঃ কামদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি। দমনক রোপন দ্বাদশী।

১৭ এপ্রিল ৩ বৈশাখ ২৭ বিষ্ণু বুধবার ত্রয়োদশী ঃ পারণ ভোর ৫-১৪ থেকে সকাল ৯-২৯ মধ্যে।

১৯ এপ্রিল ৫ বৈশাখ ২৯ বিষ্ণু শুক্রবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীবলরামের রাসযাত্রা। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত রাস। শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি।

২৬ এপ্রিল ১২ বৈশাখ ৭ মধুসূদন শুক্রবার সপ্তমী ঃ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২৯ এপ্রিল ১৫ বৈশাখ ১০ মধুসূদন সোমবার দশমী ঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৩০ এপ্রিল ১৬ বৈশাখ ১১ মধুসূদন মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ বরুথিনী একাদশীর উপবাস।

১ মে ১৭ বৈশাখ ১২ মধুসূদন বুধবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৬-৪৬ থেকে সকাল ৯-২৩ মধ্যে।

৪মে ২০ বৈশাখ ১৫ মধুসূদন শনিবার অমাবস্যা ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

৭ মে ২৩ বৈশাখ ১৮ মধুসূদন মঙ্গলবার তৃতীয়া ঃ অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা আরম্ভ। একুশদিন পর্যন্ত চলবে। শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিহার।

১১ মে ২৭ বৈশাখ ২২ মধুসূদন শনিবার সপ্তমী ঃ জহ্নু সপ্তমী।

১৩ মে ২৯ বৈশাখ ২৪ মধুসূদন সোমবার নবমী ঃ শ্রীরামপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল মধুপণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১৪ মে ৩০ বৈশাখ ২৫ মধুসূদন মঙ্গলবার দশমী ঃ তুলসী-শালগ্রামে জলধারা দান সমাপ্ত।

১৫ মে ৩১ বৈশাখ ২৬ মধুসূদন বুধবার শুক্লা একাদশী ঃ মোহিনী একাদশীর উপবাস। বৃষভ সংক্রান্তি।

১৬ মে ১ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মধুসূদন বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫৪ থেকে সকাল ৮-১৭ মধ্যে। শ্রীমতী রুক্মিনীদেবীর আবির্ভাব তিথি।

১৭ মে ২ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মধুসূদন শুক্রবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রী জয়ানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথি।

১৮ মে ৩ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মধুসূদন শনিবার চতুর্দশী ও পূর্ণিমা ঃ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত। সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিল বিহার। শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২৩ মে ৮ জ্যৈষ্ঠ ৫ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামানন্দ রায়ের তিরোভাব তিথি।

৩০ মে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ অপরা একাদশীর উপবাস।

৩১ মে ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩ ত্রিবিক্রম শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫০ থেকে সকাল ৯-১৯ মধ্যে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

৩ জুন ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৬ ত্রিবিক্রম সোমবার অমাবস্যা ।

৮ জুন ২৪ জ্যৈষ্ঠ ২১ ত্রিবিক্রম শনিবার পঞ্চমী ও ষষ্ঠী ঃ জামাই ষষ্ঠী।

১২ জুন ২৮ জ্যৈষ্ঠ ২৫ ত্রিবিক্রম বুধবার দশমী ঃ শ্রী গঙ্গাপূজা। শ্রীমতী গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব তিথি।

১৩ জুন ২৯ জ্যৈষ্ঠ ২৬ ত্রিবিক্রম বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী ঃ পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর পূর্ণ উপবাস।

১৪ জুন ৩০ জ্যৈষ্ঠ ২৭ ত্রিবিক্রম শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৪৯ থেকে সকাল ৯-২০ মধ্যে।

১৫ জুন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ২৮ ত্রিবিক্রম শনিবার ত্রয়োদশী ঃ পানিহাটি চিড়াদধি মহোৎসব। মিথুন সংক্রান্তি।

১৭ জুন ২ আষাঢ় ৩০ ত্রিবিক্রম সোমবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীল মুকুন্দ দত্তের তিরোভাব তিথি। শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১৮ জুন ৩ আষাঢ় ১ বামন মঙ্গলবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব তিথি।

২১ জুন ৬ আষাঢ় ৪ বামন শুক্রবার চতুর্থী ঃ শ্রীল তমালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

২২ জুন ৭ আষাঢ় ৫ বামন শনিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি।

২৮ জুন ১৩ আষাঢ় ১১ বামন শুক্রবার দশমী ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

২৯ জুন ১৪ আষাঢ় ১২ বামন শনিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ যোগিনী একাদশীর উপবাস।

৩০ জুন ১৫ আষাঢ় ১৩ বামন রবিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৪-৫৩ থেকে ৬-১৩ মধ্যে।

২ জুলাই ১৭ আষাঢ় ১৫ বামন মঙ্গলবার অমাবস্যা ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৩ জুলাই ১৮ আষাঢ় ১৬ বামন বুধবার প্রতিপদ ঃ শ্রী গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন।

৪ জুলাই ১৯ আষাঢ় ১৭ বামন বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব তিথি।

৮ জুলাই ২৩ আষাঢ় ২১ বামন সোমবার ষষ্ঠী ঃ হেরা পঞ্চমী! শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১২ জুলাই ২৭ আষাঢ় ২৫ বামন শুক্রবার শুক্লা একাদশী ঃ শয়ন একাদশীর উপবাস। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা (উল্টোরথ)।

১৩ জুলাই ২৮ আষাঢ় ২৬ বামন শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-৩২ থেকে ৯-২৭ মধ্যে।

১৬ জুলাই ৩১ আষাঢ় ২৯ বামন মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঃ গুরু (ব্যাস) পূর্ণিমা। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ। একমাস শাক আহার নিষিদ্ধ।

১৭ জুলাই ৩২ আষাঢ় ১ শ্রীধর বুধবার প্রতিপদ ঃ কর্কট সংক্রান্তি।

২২ জুলাই ৫ শ্রাবণ ৬ শ্রীধর সোমবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

২৫ জুলাই ৮ শ্রাবণ ৯ শ্রীধর বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঃ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

২৬ জুলাই ৯ শ্রাবণ ১০ শ্রীধর শুক্রবার নবমী ঃ নিউইয়র্কে ইসকনের প্রতিষ্ঠা দিবস।

২৮ জুলাই ১১ শ্রাবণ ১২ শ্রীধর রবিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ কামিকা একাদশীয় উপবাস।

২৯ জুলাই ১২ শ্রাবণ ১৩ শ্রীধর সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-০৫ থেকে সকাল ৯-৩০ মধ্যে।

১ আগস্ট ১৫ শ্রাবণ ১৬ শ্রীধর বৃহস্পতিবার অমাবস্যা।

৪ আগস্ট ১৮ শ্রাবণ ১৯ শ্রীধর রবিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল বংশীদাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি।

১১ আগস্ট ২৫ শ্রাবণ ২৬ শ্রীধর রবিবার শুক্লা একাদশী ঃ পবিত্রারোপনী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।

১২ আগস্ট ২৬ শ্রাবণ ২৭ শ্রীধর সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-১০ থেকে সকাল ৯-৩১ মধ্যে। শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল রূপ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

১৫ আগস্ট ২৯ শ্রাবণ ৩০ শ্রীধর বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঃ ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীবলরামের আবির্ভাব মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। চাতুর্মাস্যের দ্বিতীয় মাস আরম্ভ। একমাস দই আহার নিষিদ্ধ।

১৬ আগস্ট ৩০ শ্রাবণ ১ হৃষীকেশ শুক্রবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকা যাত্রা।

১৭ আগস্ট ৩১ শ্রাবণ ২ হৃষীকেশ শনিবার দ্বিতীয়া ঃ সিংহ সংক্রান্তি।

২৪ আগস্ট ৭ ভাদ্র ৯ হৃষীকেশ শনিবার অষ্টমী ঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত উপবাস।

২৫ আগস্ট ৮ ভাদ্র ১০ হৃষীকেশ রবিবার নবমী ঃ শ্রীনন্দোৎসব। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব মহোৎসব।

২৭ আগস্ট ১০ ভাদ্র ১২ হৃষীকেশ মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

২৮ আগস্ট ১১ ভাদ্র ১৩ হৃষীকেশ বুধবার ত্রয়োদশী ঃ পারণ ভোর ৫-১৬ থেকে সকাল ৯-৩০ মধ্যে।

৩০ আগস্ট ১৩ ভাদ্র ১৫ হৃষীকেশ শুক্রবার অমাবস্যা।

৩ সেপ্টেম্বর ১৭ ভাদ্র ১৯ হৃষীকেশ মঙ্গলবার পঞ্চমী ঃ শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা ঠাকুরানীর আবির্ভাব তিথি।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮ ভাদ্র ২০ হৃষীকেশ বুধবার ষষ্ঠী ঃ শ্রীললিতা ষষ্ঠী।

৬ সেপ্টেম্বর ২০ ভাদ্র ২২ হৃষীকেশ শুক্রবার অষ্টমী ঃ শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৯ সেপ্টেম্বর ২৩ ভাদ্র ২৫ হৃষীকেশ সোমবার শুক্লা একাদশী ঃ পার্শ্ব একাদশীর উপবাস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১০ সেপ্টেম্বর ২৪ ভাদ্র ২৬ হৃষীকেশ মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৭-০৬ থেকে ৯-২৯ মধ্যে। শ্রীবামন দ্বাদশী। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি।

১১ সেপ্টেম্বর ২৫ ভাদ্র ২৭ হৃষীকেশ বুধবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১২ সেপ্টেম্বর ২৬ ভাদ্র ২৮ হৃষীকেশ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী ব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ।

১৪ সেপ্টেম্বর ২৮ ভাদ্র ৩০ হৃষীকেশ শনিবার পূর্ণিমা ঃ

শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস দিবস। চাতুর্মাস্যের তৃতীয় মাস আরম্ভ। একমাস দুধ আহার নিষিদ্ধ।

১৭ সেপ্টেম্বর ৩১ ভাদ্র ৩ পদ্মনাভ মঙ্গলবার তৃতীয়া ঃ কন্যা সংক্রান্তি। শ্রীবিশ্বকর্মা পূজা। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

২১ সেপ্টেম্বর ৪ আশ্বিন ৭ পদ্মনাভ শনিবার সপ্তমী ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকায় পদার্পণ।

২৫ সেপ্টেম্বর ৮ আশ্বিন ১১ পদ্মনাভ বুধবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।

২৬ সেপ্টেম্বর ৯ আশ্বিন ১২ পদ্মনাভ বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-২৬ থেকে সকাল ৯-২৭ মধ্যে।

২৮ সেপ্টেম্বর ১১ আশ্বিন ১৪ পদ্মনাভ শনিবার অমাবস্যা ঃ মহালয়া।

৫ অক্টোবর ১৮ আশ্বিন ২১ পদ্মনাভ শনিবার সপ্তমী ঃ শ্রীদুর্গাপূজা।

৮ অক্টোবর ২১ আশ্বিন ২৪ পদ্মনাভ মঙ্গলবার দশমী ঃ বিজয়া দশমী। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীল মধ্বাচার্যের আবির্ভাব তিথি।

৯ অক্টোবর ২২ আশ্বিন ২৫ পদ্মনাভ বুধবার শুক্লা একাদশী ঃ পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস।

১০ অক্টোবর ২৩ আশ্বিন ২৬ পদ্মনাভ বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩১ থেকে সকাল ৯-২৬ মধ্যে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি।

১৩ অক্টোবর ২৬ আশ্বিন ২৯ পদ্মনাভ রবিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা। শ্রীলক্ষ্মী পূজা। শ্রীল মুরারীগুপ্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস আরম্ভ। একমাস মাষকলাই ডাল আহার নিষিদ্ধ। শ্রীদামোদরকে প্রদীপ দান আরম্ভ।

১৮ অক্টোবর ৩১ আশ্বিন ৫ দামোদর শুক্রবার চতুর্থী ঃ তুলা সংক্রান্তি।

১৯ অক্টোবর ১ কার্তিক ৬ দামোদর শনিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

২২ অক্টোবর ৪ কার্তিক ৯ দামোদর মঙ্গলবার অষ্টমী ও নবমী ঃ শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব তিথি। বহুলাষ্টমী। শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব তিথি।

২৪ অক্টোবর ৬ কার্তিক ১১ দামোদর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ রমা একাদশীর উপবাস।

২৫ অক্টোবর ৭ কার্তিক ১২ দামোদর শুক্রবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৩৭ থেকে সকাল ৯-২৬ মধ্যে।

২৮ অক্টোবর ১০ কার্তিক ১৫ দামোদর সোমবার অমাবস্যা ঃ দীপাবলী, কালীপূজা।

২৯ অক্টোবর ১১ কার্তিক ১৬ দামোদর মঙ্গলবার প্রতিপদ ঃ শ্রীগোবর্ধন পূজা। গো পূজা। বলী দৈত্যরাজ পূজা। শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

৩০ অক্টোবর ১২ কার্তিক ১৭ দামোদর বুধবার দ্বিতীয়া ঃ শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব তিথি। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

৩১ অক্টোবর ১৩ কার্তিক ১৮ দামোদর বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৪ নভেম্বর ১৭ কার্তিক ২২ দামোদর সোমবার অষ্টমী ঃ গোপাষ্টমী। গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের তিরোভাব তিথি।

৫ নভেম্বর ১৮ কার্তিক ২৩ দামোদর মঙ্গলবার নবমী ঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা।

৮ নভেম্বর ২১ কার্তিক ২৬ দামোদর শুক্রবার শুক্লা একাদশী ঃ উত্থান একাদশীর উপবাস। ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত আরম্ভ। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৯ নভেম্বর ২২ কার্তিক ২৭ দামোদর শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৪৬ থেকে সকাল ৯-২৮ মধ্যে।

১১ নভেম্বর ২৪ কার্তিক ২৯ দামোদর সোমবার চতুর্দশী ঃ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

১২ নভেম্বর ২৫ কার্তিক ৩০ দামোদর মঙ্গলবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। তুলসী শালগ্রাম বিবাহ। শ্রীল নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব তিথি। চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপ্ত। ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত সমাপ্ত। শ্রীদামোদরকে প্রদীপ দান সমাপ্ত।

১৩ নভেম্বর ২৬ কার্তিক ১ কেশব বুধবার প্রতিপদ ঃ শ্রীকাত্যায়ণী ব্রত আরম্ভ।

১৭ নভেম্বর ৩০ কার্তিক ৫ কেশব রবিবার পঞ্চমী ঃ বৃশ্চিক সংক্রান্তি।

২৩ নভেম্বর ৬ অগ্রহায়ণ ১১ কেশব শনিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ উৎপন্না একাদশী ও ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

২৪ নভেম্বর ৭ অগ্রহায়ণ ১২ কেশব রবিবার ত্রয়োদশী ঃ পারণ ভোর ৫-৫৬ থেকে সকাল ৯-৩৩ মধ্যে। শ্রীল কালীয় কৃষ্ণ দাসের তিরোভাব তিথি। শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২৬ নভেম্বর ৯ অগ্রহায়ণ ১৪ কেশব মঙ্গলবার অমাবস্যা।

২ ডিসেম্বর ১৫ অগ্রহায়ণ ২০ কেশব সোমবার ষষ্ঠী ঃ ওড়ণ ষষ্ঠী। শ্রীল ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

৮ ডিসেম্বর ২১ অগ্রহায়ণ ২৬ কেশব রবিবার শুক্লা একাদশী ঃ মোক্ষদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জয়ন্তী।

৯ ডিসেম্বর ২২ অগ্রহায়ণ ২৭ কেশব সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-০৬ থেকে ৯-৪১ মধ্যে।

১২ ডিসেম্বর ২৫ অগ্রহায়ণ ৩০ কেশব বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকাত্যায়ণী ব্রত সমাপ্ত।

১৬ ডিসেম্বর ২৯ অগ্রহায়ণ ৪ নারায়ণ সোমবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। ধনুঃ সংক্রান্তি।

২০ ডিসেম্বর ৪ পৌষ ৮ নারায়ণ শুক্রবার নবমী ঃ শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

২২ ডিসেম্বর ৬ পৌষ ১০ নারায়ণ রবিবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি।

২৩ ডিসেম্বর ৭ পৌষ ১১ নারায়ণ সোমবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১৪ থেকে ৯-৪৮ মধ্যে।

২৪ ডিসেম্বর ৮ পৌষ ১২ নারায়ণ মঙ্গলবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২৬ ডিসেম্বর ১০ পৌষ ১৪ নারায়ণ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা।

২৭ ডিসেম্বর ১১ পৌষ ১৫ নারায়ণ শুক্রবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব।

২৯ ডিসেম্বর ১৩ পৌষ ১৭ নারায়ণ রবিবার তৃতীয়া ঃ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীল জীব গোস্বামীর তিরোভাব।

৬ জানুয়ারী (২০২০ খ্রীঃ) ২১ পৌষ ২৫ নারায়ণ সোমবার শুক্লা একাদশী ঃ পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

৭ জানুয়ারী ২২ পৌষ ২৬ নারায়ণ মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ১০-০৭ এর পর। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব।

১০ জানুয়ারী ২৫ পৌষ ২৯ নারায়ণ শুক্রবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যা অভিষেক।

১৫ জানুয়ারী ৩০ পৌষ ৫ মাধব বুধবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব তিথি। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি। গঙ্গা সাগর মেলা। মকর সংক্রান্তি।

১৬ জানুয়ারী ১ মাঘ ৬ মাধব বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী ঃ শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব।

১৭ জানুয়ারী ২ মাঘ ৭ মাধব শুক্রবার সপ্তমী ঃ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

২০ জানুয়ারী ৫ মাঘ ১০ মাধব সোমবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ ষটতিলা একাদশীর উপবাস।

২১ জানুয়ারী ৬ মাঘ ১১ মাধব মঙ্গলবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৮-০২ থেকে ৯-৫৮ মধ্যে।

২৪ জানুয়ারী ৯ মাঘ ১৪ মাধব শুক্রবার অমাবস্যা।

৩০ জানুয়ারী ১৫ মাঘ ২০ মাধব বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী। শ্রীসরস্বতী পূজা। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব তিথি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

১ ফেব্রুয়ারী ১৭ মাঘ ২২ মাধব শনিবার সপ্তমী ঃ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২ ফেব্রুয়ারী ১৮ মাঘ ২৩ মাধব রবিবার অষ্টমী ঃ ভীষ্মাষ্টমী।

৩ ফেব্রুয়ারী ১৯ মাঘ ২৪ মাধব সোমবার নবমী ঃ শ্রীল মধ্বাচার্যের তিরোভাব তিথি।

৪ ফেব্রুয়ারী ২০ মাঘ ২৫ মাধব মঙ্গলবার দশমী ঃ শ্রীল রামানুজ আচার্যের তিরোভাব তিথি।

৫ ফেব্রুয়ারী ২১ মাঘ ২৬ মাধব বুধবার শুক্লা একাদশী ঃ ভৈমী একাদশীর উপবাস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৬ ফেব্রুয়ারী ২২ মাঘ ২৭ মাধব বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-১৪ থেকে ৯-৫৮ মধ্যে। শ্রীবরাহ দ্বাদশী।

৭ ফেব্রুয়ারী ২৩ মাঘ ২৮ মাধব শুক্রবার ত্রয়োদশী ঃ শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ব্রত মহোৎসব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৯ ফেব্রুয়ারী ২৫ মাঘ ৩০ মাধব রবিবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

১৩ ফেব্রুয়ারী ২৯ মাঘ ৪ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ঃ শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি। কুম্ভ সংক্রান্তি।

১৯ ফেব্রুয়ারী ৬ ফাল্গুন ১০ গোবিন্দ বুধবার কৃষ্ণা একাদশী ঃ বিজয়া একাদশীর উপবাস।

২০ ফেব্রুয়ারী ৭ ফাল্গুন ১১ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ সকাল ৬-০৬ থেকে ৯-৫৫ মধ্যে। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের তিরোভাব তিথি।

২২ ফেব্রুয়ারী ৯ ফাল্গুন ১৩ গোবিন্দ শনিবার চতুর্দশী ঃ শ্রীশিবরাত্রি।

২৩ ফেব্রুয়ারী ১০ ফাল্গুন ১৪ গোবিন্দ রবিবার অমাবস্যা।

২৪ ফেব্রুয়ারী ১১ ফাল্গুন ১৫ গোবিন্দ সোমবার প্রতিপদ ঃ শ্রীল রসিকানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর তিরোভাব তিথি। শ্রীল তমালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৪ ফাল্গুন ১৮ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার চতুর্থী ঃ শ্রীল পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।

৬ মার্চ ২২ ফাল্গুন ২৬ গোবিন্দ শুক্রবার শুক্লা একাদশী ঃ আমলকী ব্রত একাদশীর উপবাস।

৭ মার্চ ২৩ ফাল্গুন ২৭ গোবিন্দ শনিবার দ্বাদশী ঃ একাদশীর পারণ ভোর ৫-৫২ থেকে সকাল ৯-৩০ মধ্যে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব তিথি। শান্তিপুর উৎসব।

৯ মার্চ ২৫ ফাল্গুন ২৯ গোবিন্দ সোমবার পূর্ণিমা ঃ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব। চন্দ্র উদয় পর্যন্ত উপবাস।

চোখ বাঁধা মানুষ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক কাহিনী হতে সংগৃহীত

একদা এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে এই বলে বাজী ধরল যে, সে চোখ বাঁধা অবস্থাতেও শুধুমাত্র শব্দ শুনেই যে কোন গাড়ী চিহ্নিত করতে পারে।

এই ভাবে সে চোখ বেঁধে রাস্তার কোনাতে দাঁড়িয়ে পড়ল

এই জন্য যে, বিভিন্ন গাড়ী রাস্তা দিয়ে গেলেই সে নাম দ্বারা তাদের চিহ্নিত করতে পারে।

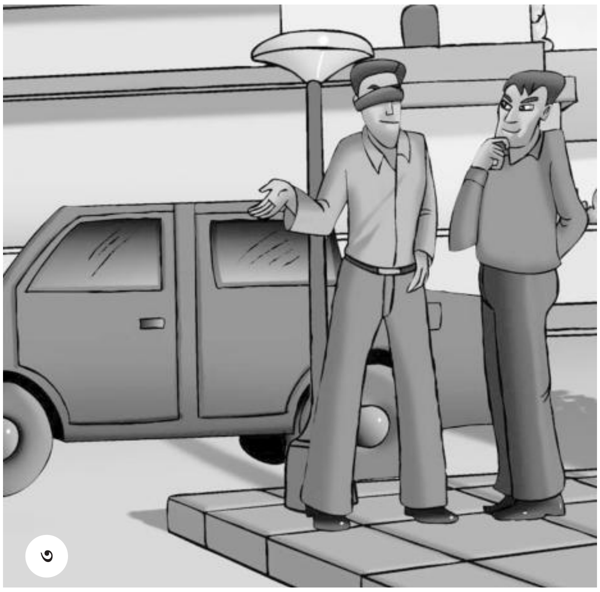

অবশেষে একটি পশু গলাতে টিনের কৌটো বেঁধে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।

তাৎপর্য / উপদেশ

আমরা আমাদের ত্রুটিযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এমন কি অতি সাধারণ বস্তুও নির্ধারণ করতে পারি না। তাই আমরা এর দ্বারা পরম সত্যকে কিভাবে অনুধাবন করবো?

ভেজ রোল

উপকরণ ঃ বড় সাইজের আলু ২ টি। পনীর ২০০ গ্রাম। ক্যাপসিকাম সবুজ, হলুদ, লাল ১টি করে। খোসা ছাড়ানো মটরশুঁটি ১ কাপ। ধনেপাতা ৫০গ্রাম। বাঁধা কপি কুচি করা সামান্য পরিমান। ছোট ফুলকপি ১টি। লবণ পরিমান মতো। চিনি সামান্য। হলুদগুঁড়ো সামান্য। কাঁচা লংকা ৪টি। ভাজা মশলা গুঁড়ো (ধনে, জিরে, শুকনো লংকা ও তেজপাতা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা) ২ চা-চামচ। ময়দা ৫০০ গ্রাম। সাদা তেল প্রয়োজন মতো। আদা ১টুকরো। গোটা জিরা ১ চা-চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ময়দা ময়ান দিয়ে লবণ দিয়ে মেখে নিন। আলু সেদ্ধ করে নিন। পনীর গ্রেট করে নিন। ক্যাপসিকাম ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ধনেপাতা ধুয়ে কুচিয়ে নিন। কাঁচালংকা ও আদা কুচিয়ে নিন। ফুলকপি টুকরো টুকরো করে ধুয়ে নিন। সেদ্ধ আলু খোসা ছাড়িয়ে চটকিয়ে নিন।

কড়াই উনুনে বসিয়ে তেল দিন। তেল গরম হলে গোটা জিরা ফোড়ন দিন। কাঁচালংকা ও আদা কুচি দিন। প্রথমে ফুলকপি, তারপর বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, আলুমাখা দিয়ে দিন। লবণ ও হলুদ দিন। খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। গ্রেট করা পনীর দিয়ে দিন। একটা ঢাকনা চাপা দিন। হালকা আঁচে কষে কষে সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে ভাজা মসলার গুঁড়ো দিয়ে নাড়তে থাকুন। একটু শুকনো শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। এভাবে পুর তৈরী হলো।

মাখানো ময়দা থেকে পছন্দ মতো আকারে লেচি করে নিয়ে বেলনে বেলে নিন। বেলানো লেচির মধ্যে কিছু কিছু পুর ভরে মুড়ে নিয়ে মুখ দুপাশে বন্ধ করে দিন। এভাবে রোল বানানো হলো।

কড়াইতে তেল গরম করুন। তেল গরম হলে এই রোলগুলি সেই ছাঁকা তেলে ভেজে তুলে নিন। তারপর টম্যাটো সস সহযোগে এই রোল থালাবাটিতে সাজিয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ১।।

মুখমধুরিমা নাহি পরিসীমা ধিকৃত শারদ শশী।
হাতে ধরি বেত্র প্রেমমত্ত নেত্র চলয়ে মন্থর গতি।।
কলিকালিনাশি অঙ্গরূপরাশি দয়াল অন্তরযামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ১।।

রসনামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম্-বসুধা-জাহ্নবা-পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ২।।

কৃষ্ণপ্রেমমতি বসু-জাহ্নু-পতি নিখিল-রস-আধার।
প্রেমরসঘন ভক্তপ্রাণধন ত্রিজগতে নাহি আর।।
মন্দমতিজনে তাঁরে নাহি জানে কেমন দয়াল স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ২।।

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ করণোদ্দাম-করুণং।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্‌বা ভব-জলধি-গর্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৩।।

গৌরাঙ্গের প্রিয় সুমঙ্গলময় পরম করুণাময়।
হরিনাম প্রচারে সবারে উদ্ধারে দূর করে ভবভয়।।
কলিযুগে হেন নাহি একজনও পতিতপাবন স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৩।।

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৪।।

'কলিপাপাচ্ছন্ন হীন জীবগণ কিভাবে সদ্গতি তার।
তব কৃপা পাবে তারা ধন্য হবে বিধান কর এইবার।।
হে গৌরাঙ্গ এবে ভক্তি দেহ সবে' — যুক্তি করে যেই স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৪।।

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশাং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৫।।

'নিত্য নিরন্তর হরিনাম করো শোনরে সকল ভাই!
ভব পারাবার পার করিবার রহিলাম আমি দায়ী।'
বলে উচ্চস্বরে গিয়া ঘরে ঘরে এমন দয়াল স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৫।।

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধুন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জত্তিমির-হর-সূর্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৬।।

দুঃখের বারিধি শোষণ করিতে যিনি কুম্ভযোনি মুনি।
কল্যাণ সাগর আমোদিত কর সমুদিত নিশামণি।।
পাপ-অন্ধকার নাশে সূর্য রূপে এমন দয়াল স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৬।।

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি মদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৭।।

নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে বলে 'হরি' দিনরাত।
নাম-সংকীর্তন করিছে যে জন তার দিকে দৃষ্টিপাত।।
পথে পথে যায় করুণা ছড়ায় এমন দয়াল স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৭।।

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথোবক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।। ৮।।

ধরে গোরাহাত প্রেমপূর্ণ চিত্ত চায় উভ মুখ পানে।
বদন চন্দ্রিমা অপূর্ব সুষমা নাচে হরিগুণ গানে।।
স্বমাধুরী দিয়া সবে মাতাইয়া চলয়ে দয়াল স্বামী।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৮।।

রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি যস্ত-
দঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে।।৯।।

ভক্তিরসদাতা সর্বসারবতা পরম করুণাময়।
স্মরণেতে তাঁর ঘুচে দুঃখভার অপরাধ দূর হয়।।
গাইহ পাঠক অপূর্ব অষ্টক সদা সুখী হবে তুমি।
শ্রীমন্ নিত্যানন্দ কল্পতরুকন্দ নিরবধি ভজি আমি।। ৯।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ব্রজধামে দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আজনক — বর্ষানা থেকে চার কিলোমিটার পূর্ব দিকে আজনক গ্রাম। বর্তমান নাম আজনেঠ। এই গ্রাম শ্রীরাধারানীর সখী ইন্দুলেখা দেবীর জন্মস্থান। একদিন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধিকা সখীদের সাথে এখানে এলেন। কৃষ্ণকে দেখে সখীরা কৌতুক সহকারে বললেন, দেখো কৃষ্ণ, রাই কত সুন্দর সেজেছে। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন, তা বটে কিন্তু পূর্ণরূপে নয়। সখীরা বললেন, তবে তুমি কি দয়া করে সাজিয়ে দিতে পারবে? তখন রাধার নয়নে কাজল দেওয়া ছিল না।

রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া।
দিলেন রাধিকা নেত্রে মহাহর্ষ হৈয়া।।
অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল।
এ হেতু এ স্থান নাম আজনক হৈল।। (ভক্তি রত্নাকর)

এই গ্রামের যে শিলার উপর অঞ্জন বা কাজল রেখে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারানীকে অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিলেন সেই শিলা অঞ্জন শিলা নামে বিদিত। অঞ্জন শিলার পাশে কিশোরী কুণ্ড এবং রাধাকৃষ্ণ মন্দির।

ইন্দুলেখা দেবীর বাবার নাম সাগর, মায়ের নাম বেলা, পতির নাম দুর্বল। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ইন্দুলেখার অঙ্গকান্তি। কারও হাতের রেখা ও দেহের অন্যান্য চিহ্ন দেখে তার জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করতে পটু। সৌভাগ্য মন্ত্রের লিখন কৌশলে কৃতকর্মা। ধাতু ও রত্ন পরীক্ষায় ওস্তাদ। তিনি দন্তচিকিৎসকও। ব্রজের যে সব সখীরা অলংকার ও পোষাক তৈরী কর্মে নিযুক্তা, যারা কোষরক্ষা বিষয়ে যুক্তা, তাদের অধ্যক্ষা হচ্ছেন ইন্দুলেখা দেবী। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রীতি উৎপাদন করে উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য বিস্তার করতে তিনি দারুণ দক্ষা। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাতে তিনি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

করেলা — আজনক গ্রামের দক্ষিণ দিকে করেলা গ্রাম। এখানে চন্দ্রাবলীর মাতামহী করলা দেবী বাস করতেন। এই করেলা গ্রামে বৃষভানুভ্রাতা চন্দ্রভানুর কন্যা চন্দ্রাবলীর শ্বশুর বাড়ী। চন্দ্রাবলীর মাতার নাম ইন্দুমতী। করলার পুত্র গোবর্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর পতি। কখনও সখীস্থলী, কখনও করেলা গ্রামে গোবর্ধন মল্ল বাস করতেন।

কামাই — করেলা গ্রামের দক্ষিণ দিকে কামাই গ্রাম। এই গ্রামে রাধারানীর জন্মদিনেই তাঁর প্রিয়সখী বিশাখার জন্ম হয়। বর্ষানার দক্ষিণপূর্ব দিকে কামাই গ্রাম। রাধার মাতামহী মুখরার বোনপো পাবন হচ্ছে বিশাখার পিতা। আয়ানমাতা জটিলার বোনঝি দক্ষিনা হচ্ছে বিশাখার মাতা। বিশাখার পতির নাম বাহিক। রাধাকৃষ্ণের সাজসজ্জা, রাধাকৃষ্ণের প্রিয় জনের মনোরঞ্জন, যুগলের দৌত্যকর্ম, তিলকরচনা, মালা ও আপীড় নির্মাণ, মণ্ডল অংকন, বিচিত্র ধরনের সেলাই কার্য, গান রচনা, চিত্রবিদ্যা, বিচিত্র ভাষা ও সঙ্গীতে বিশাখা দেবী দক্ষা। বিশাখাদেবীর অঙ্গকান্তি বিদ্যুতের মতো। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাতে বিশাখাদেবী হলেন রামানন্দ রায়।

আশেপাশের সমস্ত গ্রামে এক দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, কৃষ্ণ হচ্ছে দেবকী-বসুদেবের পুত্র! নন্দ-যশোদার না কি পুত্র নয়। মথুরাপুরীতে মাতাপিতার নির্দেশেই অক্রূর এসেছে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই সংবাদ ছড়িয়ে যাওয়া মাত্রই সর্বত্র গোপ-গোপীদের হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ জ্বালা শুরু হলো। নন্দ-যশোদার হৃদয় যেন মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় মলিন হয়ে গেল। সমস্ত গোপগোপীর অবস্থাও তাই। চতুর্দিক যেমন কালো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, তারপর বিদ্যুতের চমক দেখা যায়, তেমনই বিরহ অন্ধকারে গোপগোপীর হৃদয়ে কৃষ্ণের ছবি উঠতেই হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। এই স্থানে অক্রূরের রথ এলে—

কৃষ্ণমুখপদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা।
'হা হা প্রাণনাথ' বলি মূর্ছিত হইলা।।

বিজুলী যেমন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে, তেমনই তাঁরা মাটিতে পতিত হলো। এজন্য এই স্থান বিজোয়ারী বলে বিদিত।

লুধৌনী — আজনেঠ গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের গ্রাম লুধৌনী বা লৌধৌলী। রাধারানীর প্রিয় নর্মসখী ললিতাদেবী এখানে থাকেন। ললিতা দেবীর পতি ভৈরব। তাঁদের দুই স্থানে বাসভবন ছিল। করেলা ও লুধৌলীতে।

পিয়াসো — করেলার উত্তর-পূর্ব দিকে পিয়াসো গ্রাম বর্তমানে পেশাই নামে পরিচিত। পিপাসার্ত কৃষ্ণকে শ্রীবলরাম এখানে জলপান করিয়ে পিপাসা দূর করেছিলেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা এই স্থানে তপস্যা করেছিলেন।

নন্দবাবা, যশোদা মা, সখা-সখীদের ছেড়ে কৃষ্ণ অক্রূরের রথে করে চলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ঘটনাক্রমে বহু গোপিকা এখানে ব্যথিত বিরহ বিধুর চিত্তে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। অস্ফুটবাক্যে হা হুতাশ করছিল। তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি এখন মথুরা যাচ্ছি। ফিরে আসবো শীঘ্রই।

বিজোয়ারী — লুধৌলী গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে বিজোয়ারী গ্রাম। এটি খদিরবন ও নন্দগ্রামের মাঝামাঝি স্থান। নন্দগ্রাম থেকে দুই কি.মি. দূরে। অক্রূরজী কৃষ্ণ-বলরামকে নন্দগ্রাম থেকে এই স্থান দিয়ে রথে করে মথুরা নগরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অক্রূর নন্দ মহারাজের ঘরে রাত্রিবাস করছিলেন। পরদিন কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নন্দগ্রাম সহ

শীহ — বর্ষানা থেকে গোবর্ধন আসার পথে কামাই গ্রামের পর ডাহোলী গ্রাম। তারপর শীহ গ্রাম। নন্দবাবা, যশোদা মা, সখা-সখীদের ছেড়ে কৃষ্ণ অক্রূরের রথে করে চলে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ঘটনাক্রমে বহু গোপিকা এখানে ব্যথিত বিরহ বিধুর চিত্তে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তারা কি বলবে বুঝতে পারছিল না। অস্ফুটবাক্যে হা হুতাশ করছিল। তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি এখন মথুরা যাচ্ছি। ফিরে আসবো শীঘ্রই। শীঘ্র থেকে শীহ নাম হয়।

পরশো — শীহ গ্রামের দক্ষিণ দিকে পরশো গ্রাম। এখানে গোপিকারা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল, কৃষ্ণ! তুমি কখন ফিরে আসবে? কৃষ্ণ বললেন, এই তো কাল বাদে পরশু ফিরে আসছি। গোপিকাদের পুনরায় প্রশ্ন, সত্যি পরশু? কৃষ্ণের উত্তর, হ্যাঁ পরশু। এজন্য এই গ্রামের নাম পরশো।

সাহার — কামাই গ্রামের পূর্বদিকে সাতারপুর গ্রাম। তার

পূর্বদিকে সাহার গ্রাম। নন্দ মহারাজের বড়ো ভাই উপানন্দ ঘোষ এখানে বাস করতেন।

এ সাহার গ্রামে উপানন্দের বসতি।
অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি।।

উপানন্দ মহাশয় সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁর গায়ের রঙ শ্যাম। বদন সুন্দর। গোঁফদাড়ি শুভ্র। বুদ্ধি সূক্ষ্ম। স্বভাব অতি মধুর। বয়স বেশী হলেও যুবক রূপ। পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিকে পরাজিত করেছেন। জ্যোতিষীদের মধ্যে অগ্রণী। নন্দমহারাজের সভায় সর্বদা অবস্থান করে অতীব যত্নের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করে থাকেন।

উপানন্দের পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে যাওয়া ও অন্যান্য কার্যে সঙ্গী। সুভদ্রের পত্নী কুন্দলতা।

সুভদ্রের ভার্যা কুন্দলতা নাম যার।
কৃষ্ণ সে জীবন — যেহোঁ সখী রাধিকার।।

রাধিকা যশোদা ভবনে কৃষ্ণের জন্য রান্না করতে যেতেন। মা যশোদার নির্দেশে রাধাকে আনবার সময় সারাপথে কৃষ্ণকথা বলতে বলতে প্রীতি সহকারে রাধার তৃপ্তি বিধান করে নিজেও পরম আনন্দ লাভ করতেন এই কুন্দলতা দেবী।

যা হোক, যে সব এলাকায় কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণভাবনায় যে মহাত্মাগণ নিবিষ্ট থাকেন, সেই এলাকা পরমানন্দময় হয়ে ওঠে।

সাহার গ্রামেতে যে আনন্দ দিবারাতি।
তাহা বিবরিয়া কহে কাহার শকতি।।

শাঁখী — সাহার গ্রামের উত্তর দিকে শাঁখী গ্রাম। বৃন্দাবনে বালক কৃষ্ণ ও বলরাম বিহার করছিল। ব্রজের বালিকারাও কৃষ্ণ-বলরামের রূপ, মধুর কথা, গান ও বংশীর তানে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের কাছে গাইতে নাচতে শুরু করল। বালিকারা চন্দন চর্চিত, ফুলমালা পরিহিত, নব সাজে সজ্জিত ছিল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। মল্লিকা ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছিল। ফুলে ফুলে মৌমাছিরা গুঞ্জন করছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম অপূর্ব সুরে গান করছিল। সেই সঙ্গীতের সুরে ব্রজবালিকারা আত্মহারা হয়ে ওঠে। তখন আকাশে সুন্দর চাঁদ ও তারাগুলি শোভা পাচ্ছিল।

হঠাৎ সেখানে স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের এক অনুচর এসে পৌঁছাল। তার মাথায় শঙ্খের আকৃতির একটি অতি মূল্যবান রত্ন ছিল। তাই তার নাম শঙ্খাসুর। সে ধনগর্বে অতি গর্বিত ছিল। সে কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে মনে করল, এই

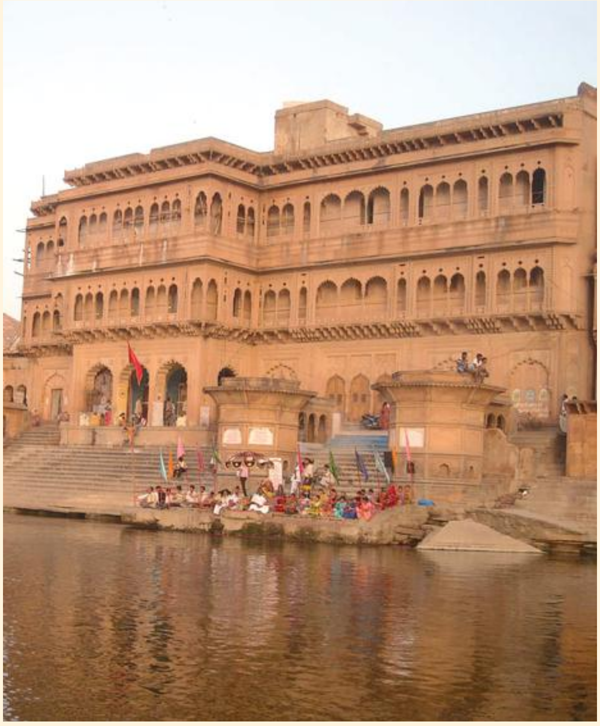

দুটো বালক এখানে কি করছে, এই সুন্দরী বালিকাগুলি একমাত্র আমারই আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী। সে তখন কৃষ্ণ-বলরামের সামনে থেকে সমস্ত বালিকাদেরকে উত্তর দিকে নিয়ে যেতে লাগল। ব্রজবালিকারা তখন তাঁদের রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের নাম ধরে ডাকতে লাগল। তখন কৃষ্ণ-বলরাম তাদের বললেন, তোমরা ভয় পেও না, অসুরটাকে দণ্ড দিতে আমরা এক্ষুনি আসছি।

দুটি শাল গাছ উপড়ে নিয়ে দুই ভাই দ্রুত শঙ্খাসুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন তাদেরকে বিশাল শক্তিশালী জ্ঞান করে শঙ্খাসুর প্রাণভয়ে বালিকাদের ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ গোপীদেরকে বলরামের তত্ত্বাবধানে রেখে শঙ্খাসুরকে ধরবার জন্য তার পিছনে পিছনে ছুটলেন। কৃষ্ণ শঙ্খাসুরের মাথার মূল্যবান মণিটি নিতে চাইছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাকে ধরে ফেললেন। শুরু হলো যুদ্ধ। খুব জোরে শঙ্খাসুরের মাথায় মুষ্ঠি আঘাত করে কৃষ্ণ তাকে হত্যা করলেন। মণিটি নিয়ে কৃষ্ণ ফিরে গেলেন। ব্রজবালিকারা সবাই সেই মণিটির দিকে তাকালেন। কৃষ্ণ সেই মণি বলরামকে উপহার দিলেন। কে মণিটি পেলে কৃষ্ণ ও সবাই বেশী খুশী হবে, এই চিন্তা করে সেই মণিটি নিয়ে বলরাম মধুমঙ্গলের মাধ্যমে রাধারানীকে দেন। শঙ্খাসুরকে কৃষ্ণ এই স্থানে বধ করেছিলেন, তাই এই গ্রামের নাম শাঁখী।

মহাজন কথা

পুরীদাস দাস

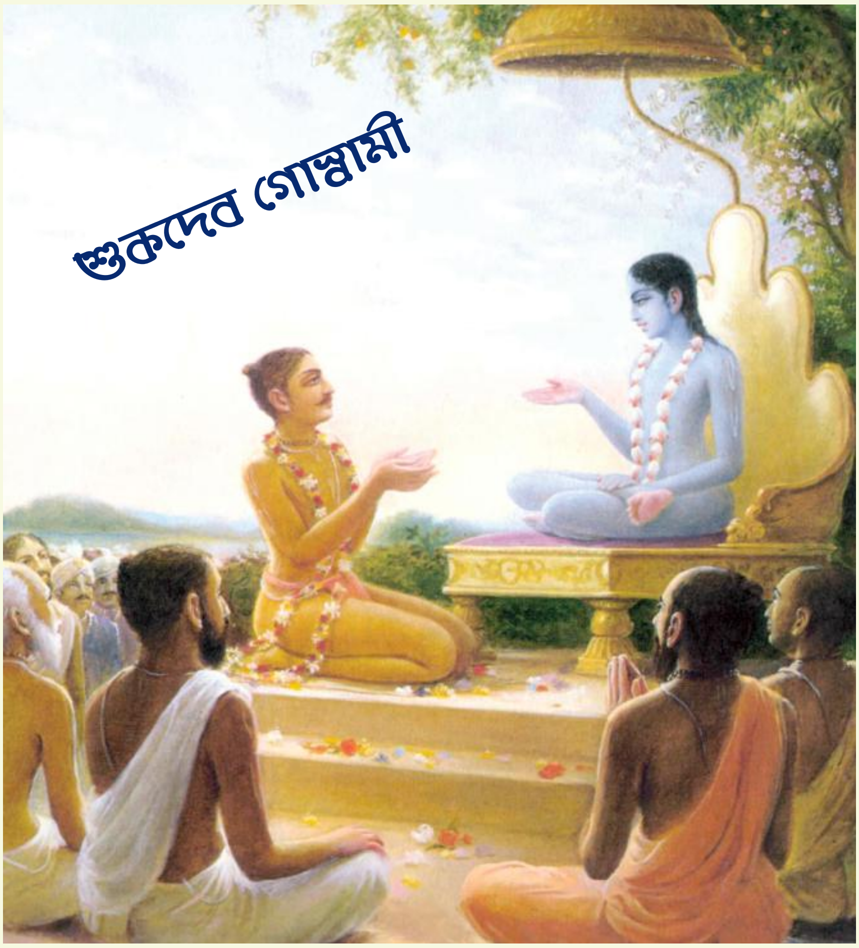

সংস্কৃত ভাষায় টিয়া পাখিকে বলা হয় শুক। এই শুকপাখি যখন কোন পাকা ফলের স্বাদ গ্রহণ করে, তখন সেই ফল আরও মধুর হয়ে ওঠে। তেমনই বেদকল্প বৃক্ষের সুপক্ব ফল শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ায় মধুরতর হয়ে উঠেছে।

পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতার কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, প্রথমে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারপর তার বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আত্মতৃপ্ত। শুকদেব গোস্বামী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও গুরু গ্রহণ করেননি, এবং দীক্ষা সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত প্রাপ্ত হননি। তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছে থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করায়, ব্যাসদেবই ছিলেন তাঁর স্বাভাবিক গুরু।

দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে একাদশতম হলেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। শুরু থেকেই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন বর্ণাশ্রমের অতীত। তাঁর একমাত্র পরিচয়, তিনি অবধূত পরমহংস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত শিক্ষার প্রমাণরূপে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অমলপুরাণ পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করেছেন, তার কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের এই সুপক্ব ফল। এই শ্রীমদ্ভাগবত আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ায়।

— 'নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।'
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৩)

জন্মের সময়ই ব্যাসদেবের পুত্র এই শুকদেব গোস্বামীর বয়স ছিল ষোল বছর। তাঁর চরণ, হাত, জঙ্ঘা, বাহু, স্কন্ধ, কপাল এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি সুন্দরভাবে গঠিত ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ণ বিস্তৃত। তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং কান দুটি ছিল ঠিক একই মাপের। তাঁর মুখমন্ডল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং শঙ্খের মতো সুন্দর। তাঁর কণ্ঠের অধঃভাগের অস্থি ছিল মাংসের দ্বারা আবৃত, বক্ষস্থল বিশাল সমুন্নত, নাভি-মন্ডল গভীর আবর্তের মতো এবং উদর ত্রিবলী রেখায় অঙ্কিত। তাঁর বাহুযুগল ছিল দীর্ঘ এবং কুঞ্চিত কেশদাম সুন্দর মুখমন্ডলের উপর ইতস্তত বিকীর্ণ দিক সমূহই ছিল তাঁর বস্ত্র এবং তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতো অতি রমনীয়।

জন্মের পূর্ব কাহিনী

কবি কর্ণপুর তাঁর আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূতে ব্যাখ্যা করেছেন শুকদেব গোস্বামী তাঁর পূর্ব জন্মে ছিলেন শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয় শুকপাখি। শ্রীমতী রাধারাণী তাঁকে বাম হস্তে ধারণ করে আদর করে দানা দিতেন আর বলতেন, 'বল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। আর এই শুকপাখি মিষ্টি স্বরে তাই বলত।

একবার এই শুকপাখি নন্দগ্রামে উড়ে গিয়ে, ঠিক শ্রীমতী রাধারাণীর মতো মিষ্টি স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডাকতে শুরু করে। কৃষ্ণ শুনে খুবই আকৃষ্ট হন। তিনি বলেন — 'আরও কিছু বল।' শুক উত্তর দেয়, 'আহা! আমি কতই না অকৃতজ্ঞ। আমি রাধারাণীর হাতে বসে, দানা, অন্ন, দুধ খাচ্ছিলাম আর তাঁর কাছে কি করে মিষ্টি করে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলতে হয় তা শিখছিলাম। কিন্তু আমি এমনই অভাগা যে সেখান থেকে উড়ে এখানে চলে এলাম।' শুনে কৃষ্ণ তাঁর নিজের হাতে পাখিটিকে নিলেন।

ইতিমধ্যে ললিতা আর বিশাখা এসে বললেন, 'এই শুকপাখি আমাদের সখী শ্রীমতী রাধারাণীর, হে কৃষ্ণ! একে ফেরত দাও।'

কৃষ্ণ বললেন, 'বেশ তো, সত্যিই এ যদি রাধারাণীর পাখি হয়, তোমরা ডাক একে। দেখ এ তোমাদের কাছে যায় কিনা।'

ললিতা আর বিশাখার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শুকপাখি যখন তাঁদের কাছে গেল না, তখন তাঁরা হতাশ হয়ে মা যশোদার কাছে নালিশ করলেন।

ব্যস্ত যশোদা কিছুক্ষণ পরে এসে কৃষ্ণের কাছ থেকে শুককে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, 'কৃষ্ণ! সারাদিন ধরে বনের পশু পাখি নিয়ে খেলা ছাড়া তো তোমার আর কোন কাজ নেই। যাও! এখন স্নানের সময়, তোমার পিতা তোমার সঙ্গে প্রসাদ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি এখনই স্নানে যাও।'

তারপর মা যশোদা সেই পাখিটিকে ললিতা ও বিশাখাকে ফেরত দিয়েছিলেন।

রাধা কৃষ্ণ তাদের লীলা সম্বরণ করার আগে এই শুক পাখিটিকে বললেন, 'হে শুক! তুমি ছাড়া আর কোনও যোগ্য আত্মা অবশিষ্ট নেই যে, শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করতে পারে, সুতরাং তুমি এখানে থেকে যাও।'

রাধা কৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পর এই শুকপাখি কৃষ্ণকথার খোঁজে ঘুরে ঘুরে শিবলোকে পৌঁছেছিল। সেখানে শিব তখন পার্বতীকে ভাগবতকথা শোনাচ্ছিলেন।

তখন সেই শুক গাছের ডালে বসে সেই কথা শ্রবণ করতে শুরু করে। কিন্তু ভাগবতের প্রথম দিকে দর্শনের আধিক্যের ফলে শীঘ্রই পার্বতী নিদ্রাচ্ছন্ন হন। তখন সেই শুকপাখি পার্বতীর গলা নকল করে 'হুঁ হুঁ' বলতে থাকে যাতে শিব তাঁর ভাগবতকথা বন্ধ না করেন।

তারপরে কথা শেষ হয়ে যাবার পর, পার্বতী নিদ্রা থেকে

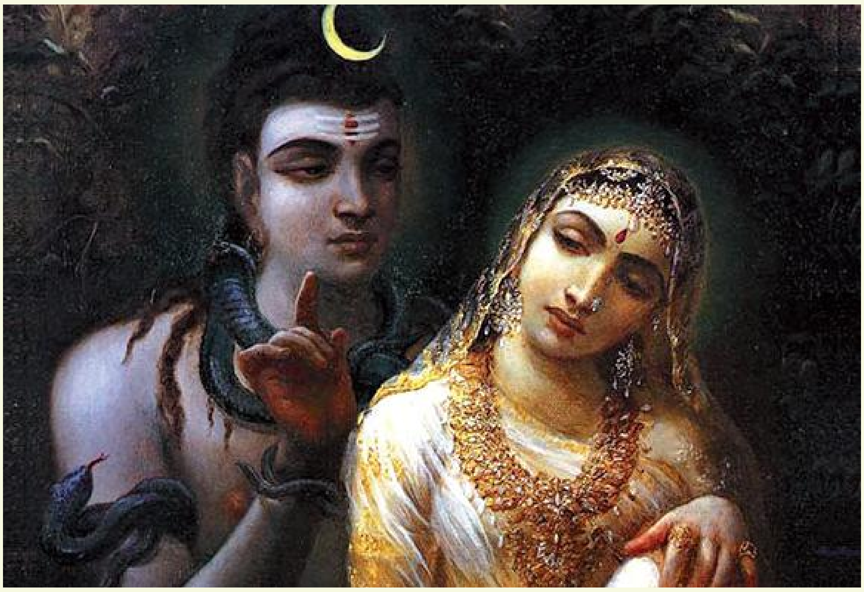

গোস্বামী শুরু থেকেই ছিলেন ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত। ষোল বছর পর্যন্ত তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছিলেন যাতে তিনি শৈশবের স্নেহের বন্ধনের দ্বারা অপ্রভাবিত থাকেন। তাই জন্মের পরেই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন।

তখন তাঁর পিতা শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে 'হে পুত্র! হে পুত্র!' বলে আহ্বান করেছিলেন কিন্তু তাতেও শুকদেব গোস্বামী ফিরে আসেননি। তখন ব্যাসদেব তাঁর রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দুটি বিশেষ শ্লোক, তাঁর শিষ্যদের আবৃত্তি করে তাঁর পুত্র শুকদেবকে অন্বেষণ করতে বলেন, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত পুরুষদেরও আকর্ষণ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই শ্লোকসমূহ শ্রবণ করে আকৃষ্ট হয়ে শুকদেব গোস্বামী ফিরে এসেছিলেন এবং তার পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে জন্মাদস্য শ্লোক সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের

উঠে শিবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে মহাদেব! আপনি আমাকে দশম স্কন্ধের বর্ণনা শোনালেন না তো।' তখন শিব বুঝতে পারলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পার্বতীর কণ্ঠস্বর নকল করে এই শুকপাখি 'হুঁ হুঁ' দিচ্ছিল। তখন শিব অযোগ্য আত্মা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছে বলে মনে করে সেই শুককে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন শুকপাখি ভয়ে উড়ে এসে বদ্রিকাশ্রমে গঙ্গার ধারে ব্যাসদেবের আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেখানে ব্যাসদেব তাঁর স্ত্রীকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শোনাচ্ছিলেন আর তাঁর স্ত্রী আশ্চর্যান্বিত তাঁর মুখ খুলে সেই ভাগবত কথা পান করছিলেন। এমন সময় সেই শুকপাখি সোজা উড়ে ব্যাসপত্নীর মুখের ভিতর দিয়ে তার গর্ভে প্রবেশ করেন আর ব্যাসদেব মহাদেবকে নিরস্ত করে বিদায় দেন।

মায়ের গর্ভে ষোল বছর থাকার পর, সেই শুকপাখি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রূপে আবির্ভূত হন। মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং স্কন্দপুরাণে এই ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

জন্মের পরের কাহিনী

শুকদেব গোস্বামী জন্মের সময় থেকেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন। সাধারণত মানুষের জন্ম হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে কিন্তু শুকদেব

শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

জন্মের সময় সাধারণত জীবাত্মা পূর্ব জন্মের স্মৃতি বিস্মৃত হয়। শুকদেব গোস্বামী বস্তুতঃ পূর্ব থেকেই ভগবানের শুদ্ধ

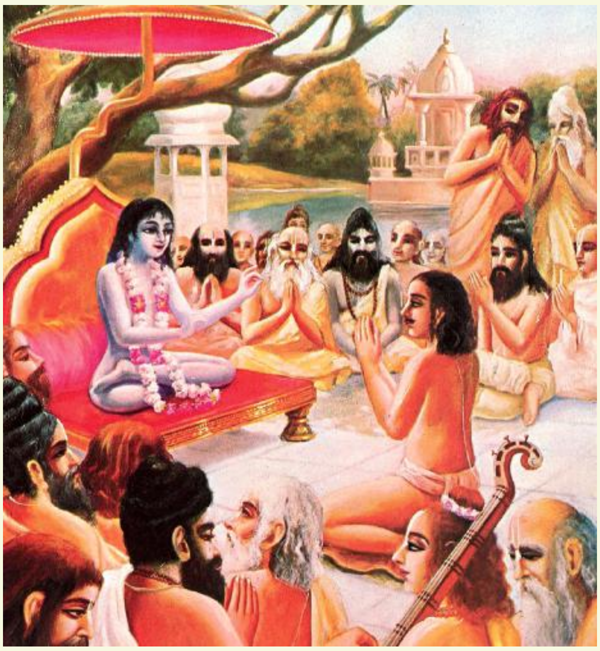

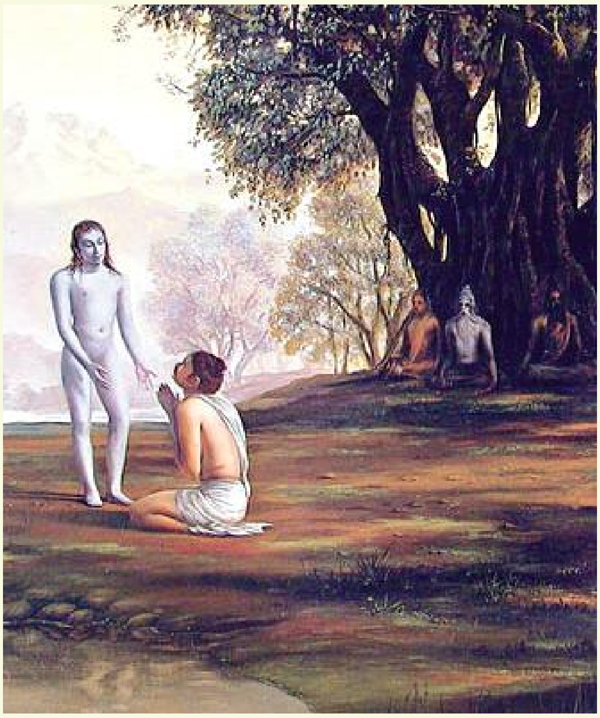

ভক্ত ছিলেন, কিন্তু জন্মের সময় তিনি সিদ্ধ নির্বিশেষবাদী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, শুকদেব গোস্বামীর মতো মহান ভগবদ্ভক্তের কাছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানেরই সমতুল্য। যদিও জন্মের পরে শুকদেব গোস্বামী নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু ব্যাস শিষ্যদের মুখে উত্তম শ্লোক ভগবানের শুদ্ধ গুণকীর্তন শ্রবণ করে শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ের শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম পুনর্জাগরিত হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শুদ্ধভক্তি সবসময়ই শুদ্ধভক্তের কৃপার অনুগামী।

এইভাবে শুকদেব গোস্বামী তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তাঁর আর প্রথাগত ভাবে বর্ণাশ্রম পালন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে কলুষিত মনকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করা। যদিও তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সদা পরমার্থ সাধনে একাগ্র চিত্ত, কিন্তু আপাত জাগতিক দৃষ্টিতে তাঁকে মূঢ় ব্যক্তি বলে মনে হতো। যদিও তিনি ষোল বছর বয়সে জন্মের পরেই বনে গমন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ দিগম্বর। তিনি বনে গমন করার সময় নগ্ন অবস্থায় স্নানরতা দেবাঙ্গনাদের নিকট দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এতই সরল ছিলেন যে, তাঁকে দেখে দেবাঙ্গনারা একটুও লজ্জা অনুভব করেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁর সন্ধান করতে যখন সেই স্থানে এসেছিলেন, তখন লজ্জাবশত দেবাঙ্গনারা তাদের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে ব্যাসদেব যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন সেই যুবতীরা উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের পবিত্র দৃষ্টিতে স্ত্রী এবং পুরুষের কোন ভেদ নেই, কিন্তু মহর্ষির দৃষ্টিতে সেই ভেদ আছে।

শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা করার পর, শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিত্রালয় পরিত্যাগ করে কুরু এবং ছাঙ্গল প্রদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর অতি উন্নত স্থিতি বুঝতে পারা খুবই কঠিন ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে মনে হতো জড়, মূক এবং উন্মাদ এক ব্যক্তি। এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় এই যে, চোখ দিয়ে দেখে কোন সাধুকে চেনা যায় না। তাঁকে চিনতে হয়, তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই শুধু চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোন সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তাঁর মুখের কথা শ্রবণ করার জন্য। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বর্ণনে সক্ষম সাধু। তা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের মনোরঞ্জন করার কোন রকম প্রয়াস করেননি। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি জনসাধারণের মনোরঞ্জন ভাগবত কথার উদ্দেশ্য নয়; বরং শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের ভক্তদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু।

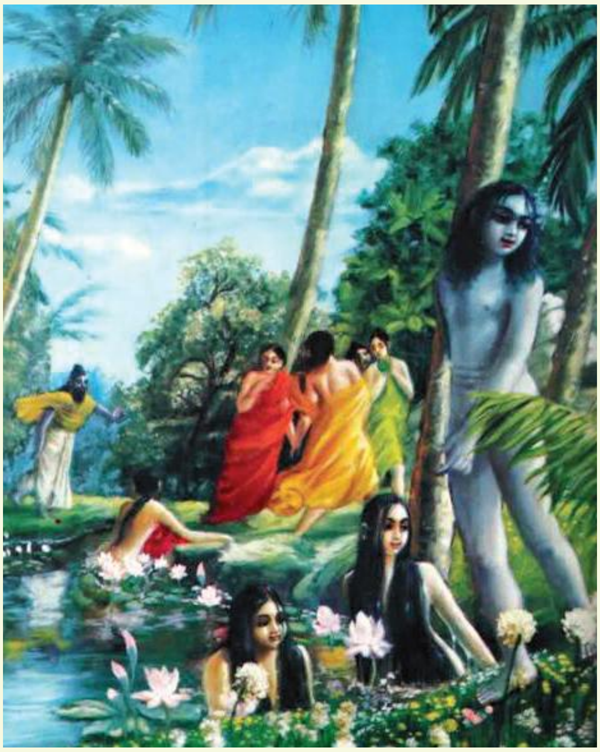

শুকদেব গোস্বামী সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি কেবল মাত্র গোদোহন কাল সময়ই কোন গৃহস্থের দুয়ারে অবস্থান করতেন। সাধারণত গোদোহন করতে সর্বাধিক আধ ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে। শুকদেব গোস্বামী তার বেশী সময় কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অবস্থান করতেন না। তিনি শুধুমাত্র মহাভাগ্যবান গৃহস্থদের কাছ থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ করতেন, এবং তা গ্রহণ করতেন কেবল মাত্র তাঁদের গৃহকে পবিত্র করবার জন্য। শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারক। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছেন তাঁদের কাছে শুকদেব গোস্বামীর এই আচরণ অত্যন্ত শিক্ষনীয়।

শুকদেব গোস্বামীর শ্যামবর্ণ ও নবযৌবন সমন্বিত অত্যন্ত সুন্দর দেহের লক্ষণ সমূহ বিচার করে, মহর্ষিরা তাঁকে এক মহাপুরুষ বলে চিনতে পেরে, তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন সংবাদ পেলেন যে, ঋষিপুত্রের অভিশাপের ফলে অচিরেই তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করবার জন্য সুরধুনী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি সবরকম আসক্তি ও সঙ্গ পরিত্যাগ করে শান্ত ভাব অবলম্বন করেছিলেন। সেই সময় ভুবন পাবন মহানুভব মুনিরা তাঁদের শিষ্যসহ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা।

মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত দৈন্যতা সহকারে মহর্ষিদের গুণকীর্তন পূর্বক অভ্যর্থনা করার পর, তাঁর প্রায়োপোবেশনের অভিলাষের কথা বর্ণনা করে সকলকে ভগবান বিষ্ণুর লীলা সমূহ কীর্তন করার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর কথা শুনে স্বর্গের দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে পুষ্প বৃষ্টি করেছিলেন। সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা পরীক্ষিতের সংকল্পের প্রশংসা করেছিলেন এবং 'সাধু' 'সাধু' বলে তা অনুমোদন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমধামে ফিরে না যান, ততক্ষণ তাঁরা সেখানে প্রতীক্ষা করবেন। তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শোনার অভিলাষে, মহর্ষিদের উদ্দেশ্যে সমস্ত পরিস্থিতিতে মানুষের, বিশেষ করে মরণোন্মুখ মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। এমন সময় ব্যাসদেবের শক্তিমান পুত্র শুকদেব গোস্বামী যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হন।

শুকদেব গোস্বামীর শ্যামবর্ণ ও নবযৌবন সমন্বিত অত্যন্ত সুন্দর দেহের লক্ষণ সমূহ বিচার করে, মহর্ষিরা তাঁকে এক মহাপুরুষ বলে চিনতে পেরে, তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁকে অবনত মস্তকে তাঁকে তাঁর মুখ্য অতিথি রূপে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কাউকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কারও করমর্দন করেছিলেন, কারও প্রতি ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়েছিলেন। তারপর সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে, পিতা ব্যাসদেব ও নারদ মুনিকে প্রণাম করে শুকদেব গোস্বামী শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করেছিলেন। সেই সভায় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষি সমূহে পরিবৃত হয়ে, মহাবীর্যবান শুকদেব গোস্বামী তখন গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজিতে পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো অতি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন।

তারপর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর কাছে এসে তাঁকে অবনত মস্তকে প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে সুমধুর বচনে তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন। আর উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ধীরে ধীরে দ্বাদশ স্কন্ধ ব্যাপী অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীল সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা করার প্রাক্কালে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণতি নিবেদন করে বলেছেন —

যঃ স্বানুভাবমখিল শ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৩

অর্থাৎ — 'সংসাররূপ গভীর অন্ধকারে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ সদৃশ সর্বপুরাণ রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাস-তনয় শ্রীল শুকদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'

পুরীদাস দাস, ইসকন কোলকাতা ব্রহ্মচারী আশ্রমে নিয়মিত সেবা করেন।